রামজন্মভূমি মানি না

বাবরী মসজিদ আমাদের চাই

শিবপ্রসাদ রায়

রামজন্মভূমি মানি না

বাবরী মসজিদ আমাদের চাই

শিবপ্রসাদ রায়

তুহিনা প্রকাশনী
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : ৮.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশ বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নস্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহিষ্মান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszld
মারমুখী হিন্দু

।। বাবরী মসজিদ আমাদের চাই।।

"বাবরী মসজিদ আমরা মুক্ত কোরবোই এবং দেশ ভাগের কথা এখনই ভাবছি না।" একথা বলেছিলেন সৈয়দ শাহাবুদ্দিন সাহেব। ১৯৮৬ সালে গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে। অথচ দীর্ঘকাল এই মন্দির তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল কোনো মুসলমান কখনও এ নিয়ে একটি কথা বলেনি। এ থেকেই বোঝা যায় এই ধর্মস্থানটিকে কেন্দ্র কোরে তাদের কোনো আবেগ বা শ্রদ্ধা ছিল না। কোর্ট যখন মন্দিরটি হিন্দুদের জন্য খুলে দিল তখন থেকেই মৌলবাদী মুসলমানেরা এটিকে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত কোরতে চাইলেন।

'আদালতে রায়কে অবমাননা কোরে রাস্তায় রাস্তায় নামাজ পড়া শুরু হোয়ে গেল। বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত ভাবে দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হোল। বহু হিন্দু নিহত হলো। কাশ্মীরে ৪৫টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হোলো। শত শত হিন্দু নারীর সম্ভ্রম নাশ করা হলো। নিহতের সংখ্যা ব্যাপক। ম্যাসাকার এতো বিস্তৃত এবং গভীর যে কাশ্মীরে আর হিন্দু আদৌ বাস কোরতে পারবে কিনা এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। পাকিস্তানে ৯টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং হিন্দুদের দোকান লুটপাট করার ঘটনাও ঘটে গেছে। শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী মুসলীম নেতাদের উক্তি "এখনই দেশ ভাঙ্গার কথা ভাবছি না।" অর্থাৎ যথাসময়ে দেশ আবার ভাঙ্গা হবে।

এই সকল ঘটনার একটি নির্দিষ্ট যোগফল আছে এবং এইসব আচরণ ও উক্তির একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। এই সত্যটি এদেশের মানুষ বুঝতে বিলম্ব করেন এটাই এদেশের জাতীয় জীবনে বিষণ্ণতম ট্রাজেডী। অযোধ্যার এই বিতর্কিত ধর্মস্থানটি হিন্দুদের রামজন্মভূমি না মুসলমানদের বাবরী মসজিদ শুধুমাত্র এই চিন্তায় কেন্দ্রীভূত হোয়ে যারা তথ্য সংগ্রহ কোরছেন সেই সব লেখক সাংবাদিকের নির্বুদ্ধিতা হতভাগ্যের পরিচয় সুচিত

করে। এরা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়নে অক্ষম এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে অনিচ্ছুক। ভারতে আবার পাকিস্তান সৃষ্টির পরিস্থিতি তাদের চোখে পড়ে না। ভারত যখন প্রথম খণ্ডিত হয় তখনও এরা কেউ বুঝতে পারেনি। আজকের ভারতে এই অবুঝদের সংখ্যা যেন আরও বেড়েছে। তাই কাশ্মীরের নরমেধ যজ্ঞ তাদের রক্তে আগুন ধরায় না। পাকিস্তানে মন্দির ধ্বংসের কোনো প্রতিবাদ হয় না। ভারত ভাঙার কথায় বিচলিত বোধ করে না কোনো রাজনৈতিক নেতা।

রাম মন্দিরের শিলান্যাসে বাধা দিয়ে মাথায় প্রথম আঘাত বরণের জন্য লাঠি ধরে ধরে অযোধ্যায় যেতে পারেন প্রয়াত বৃদ্ধভাম ব্রাহ্মণ কমলাপতি ত্রিপাঠি। সি সি আই, সি পি এম-এর হাজার হাজার হিন্দু যেতে পারে মন্দির নির্মাণে বাধা দিতে। শেষ পর্যন্ত এরা কিছুই করতে পারেনি। লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছে হিন্দু জাগরণ দেখে। কিন্তু সংবাদপত্র আর রাজনৈতিক নেতাদের আচরণ এবং বক্তব্য দেখে মুসলমানেরা উৎসাহিত হয়েছে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অকারণ হিন্দুদ্রোহীতা রাষ্ট্রদ্রোহীতা দেখে মুসলমানেরা হিন্দু সমাজকে অচলায়তন বধযোগ্য ভেবে দখলের আগ্রহ দেখাবে এটা তো স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত প্রায় বাহার লক্ষ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান এসেছে বাংলাদেশ থেকে। ২০ লক্ষ পাকিস্তানী বিহারী মুসলমান তারাও ঢুকেছে ভারতবর্ষে। কোলকাতায় অধিকাংশ ফেরিওলাদের ভাষা এবং চেহারা দেখলেই তাদের চেনা যায়। বাকীরা চলে গেছে আণ্ডার ওয়ার্ল্ডে। অপরাধের জগতে। কাশ্মীরের প্রতিদিনের ঘটনার বিবরণ পড়ে কি মনে হয়? পাঞ্জাবের রক্তস্রোতের পিছনে কাদের হাত একি কারো অজানা। ভারতের একটি বড়ো অংশের মুসলমানদের সক্রিয়তা এবং পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতই এইসব ঘটনার উৎস। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয় এক মুহূর্তে। ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ কোরে কয়েক লক্ষ হিন্দুকে কাশ্মীরে বসবাসের ব্যবস্থা কোরে দিতে হবে। চুক্তি যেটা আছে তাকে চূড়ান্ত ভারতভুক্তি বলা যায়

না এবং চুক্তি ছিল সাময়িক। ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া প্রত্যেকটি দল এই ভারত বিরোধী সর্বনাশা চুক্তির স্বপক্ষে। একথা ঠিক যে হিন্দু ধর্মান্ধ নয় তার ধর্ম চেতনাই তাকে কোনোকালে মৌলবাদী পরধর্ম বিদ্বেষী হতে দেয়নি। দেবে না। কিন্তু সে উন্মত্ত হোতে পারে এবং এই উন্মত্ততায় সে বিশ্বের সকলকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। যখন সে দেখবে তার ভালোবাসার বাসভূমি একমাত্র দেশ ভেঙে যাচ্ছে। এবং বারবার ভেঙে দেবার হুমকি দিচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ারূপে হিন্দুর বুকে কি আগুন জ্বলে উঠছে, রাজনৈতিক নেতারা কিন্তু তার কোনো খবর রাখছেন না। আর একথা তো সত্য। গত ৪৩ বছর ধরে ভারতের নেতারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কোরতে পারেননি। কথাবার্তা যা হয়েছে তা শুধু বাগবিস্তার এবং মুসলীম তোষণ। যেমনটি ছিল দেশ বিভাগের আগে। তাতে হিন্দুর ক্রোধ কমাবার কোনো চেষ্টাই হয়নি। বরং সেটা অকারণে সবদিকে সর্বত্র বাড়ানো হচ্ছে।

হিন্দু মার খাবে অপমান সহ্য করবে মুসলমানেরা ভারত ধ্বংসের চেষ্টা কোরবে আর রাজনৈতকি দলগুলি তাদের সব খারাপ কাজ আড়াল করে হিন্দুদের দোষারোপ করবে। এই দৃশ্যই আজ সবার চোখে পড়ছে। এই আত্মঘাতী প্রবণতা সারা দেশকে আচ্ছন্ন কোরে রেখেছে, এটা জেনে গেছে ভারতের সকল শত্রুরা। তাই তারা প্রত্যেকটি সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। স্বামী পরিত্যক্তা বৃদ্ধা-মহিলা শাহবানুকে খোরপোষ দিলেই ইসলাম উচ্ছেদ হোয়ে যাবে এটা কোনো সুস্থ যুক্তির কথা নয়। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্রে করে ভারতের মুসলমানদের বড়ো অংশটিকে সরকার, সরকারি আইন কানুন এবং হিন্দু বিরোধী করে তোলা যাবে, যার প্রত্যক্ষ লাভ এরা যাতে এদেশের সংবিধান আদালতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জাতির মূল ধারায় যেন মিশে না যায়। পরোক্ষ লাভ এই রকম বিচ্ছিন্ন মানসিকতা থেকেই জন্ম নেবে আর একটি পাকিস্তান। ধীরে ধীরে গোটা ভারত হবে মুসলিম রাষ্ট্র। এই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক মুসলীমদের পরিস্থিতির বিশেষণ। এই বিশ্লেষণ থেকেই

তারা রামজন্মভূমিতে আন্দোলনের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। স্বাধীন ভারতে ঐ মন্দিরে তালা ঝুলিয়ে দেবার পর মুসলমানেরা বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি এই ধর্মস্থানকে। পিছনের দরজা দিয়ে নিত্য পূজা করে গেছেন হিন্দু পুরোহিত। তাতেও বাধা দেয়নি কেউ। আদালতে ইঙ্গিতে তালা খুলে যে মুহূর্তে মন্দিরের ভার দেওয়া হলো হিন্দুদের হাতে, মুসলমানদের ভক্তি শ্রদ্ধা যেন তখন থেকেই উদ্বেল হোয়ে উঠতে দেখা গেল। আবার আদালতকে অপমানের সুযোগ নিলো তারা। রাস্তায় রাস্তায় নামাজ পড়ে দাবি তুললো, আদালতের রায় মানছি না। ওটা বাবরী মসজিদ। আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

লাঞ্ছনা অপমান মুখ বুজে সহ্য করে কোনরকমে ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকে যারা-হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি নতুন সম্প্রদায়, যাদের নাম 'ভীতু সম্প্রদায়'। তাঁরা অনেকেই বললেন, কি দরকার ছিলো তালা খোলার। বেশ ছিল বন্ধ হোয়ে। আর এদেশের বুদ্ধিজীবিরা, যারা প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রবঞ্চক কিন্তু নতুন নতুন কথায় সেটা চাপা দিয়ে প্রমাণ করেন তারা উদার এবং পণ্ডিত। তাঁরা বললেন, ওটা হিন্দু মুসলমান সকলের জন্য স্মৃতিসৌধ করে দেওয়া হোক। কেউ বললেন, রামচন্দ্রের ওটাই জন্মভূমি কিনা, এটা তো কিংবদন্তী। ঐতিহাসিক সত্য হোচ্ছে ওটা হিন্দুমন্দির যা ভেঙে বাবর মসজিদ করেছিলেন। একথায় প্রমাণ হচ্ছে বাবর হিন্দুর মন্দিরকে ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক সত্যটা শুরু হয়ে গেল মসজিদ হবার পর। কতো ঘৃণা এবং বিদ্বেষ নিয়ে বাবর রামমন্দিরকে অপবিত্র এবং ধ্বংস করলো সেটা উল্লেখ করতে সাংবাদিক লেখকদের বড়ো সংকোচ। সত্য বড়েঅ নিষ্ঠুর যে। নির্মম সত্য এবং ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে খৃষ্টের জন্মের একশ বছর আগে রাজা বিক্রমাদিত্য অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে একটি বিশাল মন্দির তৈরি করেন। ইংরেজ ইতিহাসকার ইলিয়ট লিখেছেন, এই মন্দিরে ৮৪টি দুর্লভ কষ্টিপাথরের স্তম্ভ লাগানো হয়েছিল। প্রত্যেকটি স্তম্ভে সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে শোভিত ছিল রাম, সীতা এবং হনুমানের মূর্তি।

এই এলাকার বাস করতেন দুজন মুসলমান ফকির। একজনের নাম খাজা আবাবাস মুসা আসকান কালান্দার শা এবং জালাল শা। এইসব পীর ফকিরদের প্রকৃত ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। এরা অদিকাংশই ইসলাম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অগ্রবর্তী বাহিনী। ধর্মের নামে গুপ্তচরবৃত্তিই এদের কাজ। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণী সংগ্রাম সিংহের নিকট পরাজিত হয়ে বাবর লুকিয়েছিলেন অযোধ্যার কাছেই। এই দুই ফকিরের নাম শুনে বাবর একদিন দেখা করেন। "বাবরনামা" গ্রন্থে বাবর নিজেই লিখেছেন, আমি তখন নিরাশ হতাশ। আমাকে উৎসাহিত করতো দুই ফকির। বললো-"আমরা আশীর্বাদ করছি এবং ভবিষ্যতবাণী করছি তুমি আবার যুদ্ধ করো এবার অবশ্যই জয়ী হবে।"

হিন্দু সমাজে বহু উচ্চ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন গুরু, সাধু, সন্ন্যাসী আছেন। থাকেন পরগাছার মতো। এই সমাজের কাছে থেকে সব কিছু গ্রহণ করেন আর শিষ্যবর্গকে যুদ্ধ বিমুখ বিস্তার বিমুখ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর তৈরি করে দেন। সবধর্মই সমান বলে অন্য ধর্মের খাদ্যে পরিণত কোরে দেন। নিজেদের ধর্মকে বিশ্বব্যাপী বিস্তারের কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। নিজের শিষ্যবর্গ এবং আশ্রম নিয়ে নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছেন। এরা দেখেও শিখতে পারেন না। ভগ্নোদ্যোম বাবর নতুন উৎসাহে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করলেন সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে। এবার জয়লাভ করলেন। সম্রাট হবার পর অযোধ্যায় এলেন দুই ফকিরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

দুই ফকির আব্দার জানালেন, রামের জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে যে মন্দির এটা ভেঙ্গে মসজিদ করে দাও। এই মসজিদ ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে একটি ছোট মক্কা। তখনই ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সুবিধা হবে। শুধু গায়ের জোরে এই বিশাল ভারতবর্ষ তুমি শাসন করতে পারবে না। এর জন্য লাখো লাখো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মানুষ চাই। দুই ফকিরের নির্দ্দেশে বাবর তাঁর অন্যতম সেনাপতি মীর বাঁকি তাসখন্দিকে আদেশ দিলেন সসেন্যে মন্দির আক্রমণ

করতে। মীর বাঁকি মন্দির আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো। প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন হংসবরের রাজা বিজয় সিংহ, মকরহীরের রাজা সংগ্রাম সিংহ, ফৈজাবাদ জেলার ভিটি রাজ্যের রাজা মহতাব সিংহ। ঐতিহাসিক ক্যানিংহাম লিখেছেন, রামজন্মভূমির ধ্বংস উদ্দোগ দেখে ঐক্যবদ্ধভাবে হিন্দুরা মোগল অস্ত্রের সামনে বুক পেতে দেয়। একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার হিন্দু নিহত হওয়ার পর মীর বাঁকি খাঁ কামানের সাহায্যে মন্দির ধ্বংস করে দেয়। বারাবাংকি জেলার গেজেটিয়ারে হ্যামিলটন সাহেব লিখেছেন, হিন্দুদের রক্ত আর চর্বি দিয়ে চুন সুরকি মেখে মসজিদের ভিত্তি তৈরি করার জন্য জালাল শা ইট সরবরাহ করেছিল। বাবর নিজেই আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কালান্দার শার নির্দ্দেশে রামচন্দ্রের জন্মভূমিকে ধ্বংস করে আমি মন্দিরের মশলা দিয়েই ওখানে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছি। একথা বাবরের স্বরচিত জীবনীতে আছে।

বাবরের নিজের উক্তি ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ রামমন্দিরের স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও যে নির্বোধেরা বিতর্ক তুলছে, তারা মোটেই নির্বোধ নয়, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই তারা এটা বলছে। শুধু সত্য এবং তথ্যই নয়, এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এক মহাসংগ্রামের ইতিহাস এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগের অভুতপূর্ব কীর্ত্তি। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সংগ্রামের শুরু, আর শেষ হয়েছে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ হয়েছে একথা বলার সময় বোধহয় এখনো আসেনি। পৃথিবীতে ভারতই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে একটি মন্দিরের জন্য সংগ্রাম চলে ৪০৬ বছর ধরে। আত্মদান করে মোট তিন লাখেরও বেশী হিন্দু।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, হিন্দুরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে স্বধর্ম রক্ষার প্রেরণায়। মুসলমানেরা অন্যায় যুদ্ধ করে অন্য ধর্মের মন্দির দখল করতে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করেছে অকারণে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে অত্যাচার হয়, হত্যা হয় ওটা হিন্দু মুসলমান বলে কোনো কথা

নেই। এই ভাবনায় ভাবিত আছেন অনেক হিন্দু। তাদের কাছে বিনীত জিজ্ঞাসা হিন্দু কখনো তার ইতিহাসে একটি ধর্মস্থানের, তাও অন্যের দখল কোরেছে কি? এবং তা দখল করতে গিয়ে এইরকম রক্তের বন্যা এবং প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে কি? উত্তর নেই? তুব এই দেশে এমন এক আত্মঘাতী প্রবণতা আজ জাগ্রত হয়েছে যার প্রেরণায় বহু মানুষ বলে, সবধর্মই সমান। সকলের মধ্যেই ভালো মন্দ আছে।

কোরাণ পরিষ্কার বলেছে, যে আল্লায় বিশ্বাসী নয় সে কাফের, বধযোগ্য। কোরাণে আছে রমজান মাসের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যদি চোখে পড়ে কোনো কাফের, তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে। এগুলো একটি ধর্মের অনুশাসন। এদেশের হিন্দুরা কোরাণ পড়বে না। চারপাশের মুসলমানদের আচরণগুলোকে ভালো করে বিচার করবে না। মুসলমানেরাও চায় না সর্বস্তরের মানুষ কোরাণ পড়ুক। কোরাণে কি আছে জানুক। অনেকের ধারণা মুসলমানেরাও সবাই কোরাণে কি আছে জানে না। অনেকে আরবী ভাষায় কোরাণ পড়ে কিন্তু বাংলা জানে না। আমেরিকার অরবিন্দ ঘোষ "কোরাণ এ্যান্ড কাফের' বলে একটা বই লিখেছেন। বইটার সব উদ্ধৃতি কোরাণ থেকে। তবু ভারতে বইটা চলতে দেওয়া হলো না। শাহাবুদ্দিন ইন্দিরা গান্ধীকে বারংবার অনুরোধ কোরে বইটা ভারতে নিষিদ্ধ করে দিলো। কোলকাতা হাইকোর্টে কোরাণ নিয়ে মামলা শুরু হতেই মুসলমান সমাজে একটা চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। প্রতিবাদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারে চাপ সৃষ্টি করে মামলা প্রত্যাহার করানো হলো।

কোরাণকে সর্বমানবের কন্যাণকর একটি গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। যা সর্বলোকের পক্ষে হিতকারী এবং সকলের জন্য উপযোগী। যে গ্রন্থটি সব সময় মানুষের চোখের সামনে আছে কোনো ভাবেই যার বিকৃতি ঘটেনি। এই রকম একটি গ্রন্থের বিরুদ্ধে মামলা হোলে আতঙ্কের কি আছে? বরং মামলা চলাকালীন সংবাদপত্রে আলোচনার কারণে বহু মানুষ ইসলামের

শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারতো। ইসলাম সত্যিই কি বস্তু তা সহজেই জানতে পারতো। এখানেই মুসলমানদের আপত্তি। তারা জানে সবাই যদি কোরাণের সত্য জানতে পারে তাহলে সারা পৃথিবীতে ইসলাম জগতেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লব হয়ে যাবে। তাই কোরাণ নিয়ে তারা প্রকাশ্যে আলোচনা হতে দিতে চায় না। পণ্ডিত হিন্দুরা জগতের সব ব্যাপারে আগ্রহী, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনায় তাদের বড়োই অনীহা। অন্যধর্মের দেবস্থান চূর্ণ করা অপবিত্র করা ইসলামের একটি পবিত্র কর্তব্য।

মুসলমানদের মধ্যে অনেক ভালো মানুষ আছে শোনা যায়। অতীত ইতিহাসে এবং বর্তমানে এমন একজন মুসলমানের নাম শোনা গেছে কি, যিনি হিন্দুর মন্দির ধ্বংসের কোনো প্রতিবাদ করেছেন। বাংলাদেশে নাকি দারুণ প্রগতি। ওখানকার কবিদের নিয়ে এসে এই বঙ্গে কাব্যের ফোয়ারা ছোটানো হচ্ছে। কবিতার মধ্যে দিয়ে দুই দেশ একাকার হয়ে যাচ্ছে। একজনও কবির নাম এ পর্য্যন্ত শোনা য়ায়নি বাংলাদেশে যিনি রমনার কালীবাড়ী চূর্ণ করার পর সেটি নির্মাণের জন্য একটি বিবৃতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কবিরা ভুলেও সে কথা তোলেন না। এদেশের কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, নেতা, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী সবাই শূন্যবাদী। পায়ের তলায় মাটি এঁরা খোঁজেন না। জানেন না আত্মরক্ষার অতি সাধারণ কথাগুলি। দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে তাই এদের কোনো সচেতনতা নেই। তাই বিপদের দিনে এঁরা নিজেরাও হতচকিত হয়ে যান হতবুদ্ধি হয়ে যায় গোটা সমাজ। মুসলীম ব্যক্তিগত আইন, রামজন্মভূমি একটা আকস্মিক কিম্বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এক একটা অশনি সংকেত। একথা উপলব্ধি করতে দেরী হলে ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকবে না। পাকিস্তান বাংলাদেশ হওয়ার পর পালিয়ে এসে স্মৃতিচারণের আত্মরক্ষার জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। এবার আর সে সুযোগ পাওয়া যাবে না। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হিন্দু সমাজের এবার রুখে দাঁড়ানো দরকার। মনে রাখতে হবে, পৃথিবী শুধু যুক্তি দিয়ে চলে

না, চলে শক্তি দিয়ে। ইসলাম ভারতে সনেট নিয়ে আসেনি এসেছিল বেয়নেট নিয়ে। ভারতে মুসলিম শাসন কায়েম হয়েছে যুক্তি দিয়ে নয়, শক্তি দিয়ে। এখনও তারা বলছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুস্থানের প্রতিটি ইঞ্চি জমি রক্ত দিয়ে জয় করেছিল। তাই হিন্দুস্থান শাসন করার হক আমাদের। এই আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গী ভঙ্গির সঙ্গে তারা নিচ্ছে গণতন্ত্রের সুযোগ। মাথা গুণতি ভোট। তাই নানাভাবে তারা সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। হিন্দু সমাজ কোনোদিক থেকে যেন প্রতিরোধ করতে না পারে। আত্মসমর্পণই যেন বাঁচার পথ বলে মনে করে। এই ভাবেই দাবার খুঁটি সাজিয়ে চলেছে তারা। রাজনৈতিক দলের নেতারা রাষ্ট্ররক্ষার কথায় ভালোকথায় সৎকথায় নির্বিকার। কারণ তাদের সব হিসেব ভোটের দিকে তাকিয়ে। গণতন্ত্রে দুটি রাষ্ট্রদ্রোহীর গুরুত্ব একজন দেশপ্রেমিকের অপেক্ষা বেশী। কারণ তাদের দুটি ভোট। একটি সাধুর চেয়ে দুটি চোরের শক্তি গণতন্ত্রে অধিক। একটি বিদ্বানের অপেক্ষা দুটি মুর্খের দাম গণতন্ত্রে বেশী। আর মুসলমানেরা ভারতের সব দলকে আন্দাজ দিয়ে দিয়েছে যে আমরা যে দলেই থাকি প্রথমে আমরা মুসলমান। শতকরা ১১টা ভোটে মাত্র আমাদের কিন্তু মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ ভোট। তাই আমাদের সব উৎপাত সব দল হাঁসিমুখে মেনে নিতে বাধ্য। অবাক হবার মত কথা এটাই যে হিন্দুদের ভোট শতকরা ৮৯ তারা এগুলো দেখেও কি করণীয় বুঝতে পারে না। ক্ষোভ প্রকাশ করে দুঃখ করে অভিযোগ করে। শতকরা ২৭টা হিন্দুভোট ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতের রাজনীতির চালচিত্রটাই বদলে যেতে পারে এই কাণ্ডজ্ঞানটা হিন্দুদের নেই। তারা আইনানুগ পথে যেতে চায়। মেয়ে নিয়ে চলে গেলে রাষ্ট্রপতিকে আবেদন জানায়। হিন্দু পাড়ায় গোরু কাটলে থানায় গণ দরখাস্ত দেয়। হিন্দুরা হিন্দুর নামে সংগঠিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হয় এটা সে করবে না।

হিন্দুরা সংগঠিত নয় বলে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা সব বুঝেও অপমান সহ্য করে। মুসলমানদের তোষণ করতে বাধ্য হয়। হিন্দু কমরেড

গোমাংস খেয়ে সংস্কারহীন সাচ্ছা মার্ক্সবাদী রূপে প্রমান করে নিজেকে। অথচ সে ভালো করেই জানে কোনো মুসলীম কমরেডকে শুয়োরের মাংস খাবার প্রস্তাব দিলেই তার মুখের ভূগোল বদলে দেবে। হিন্দু পাড়ায় আফিম শোষণের হাতিয়ার বক্তৃতা দিয়ে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে সেই কমরেডকেই বলতে হয় সংখ্যালঘুর ধর্ম রক্ষার জন্য লড়ছি লড়ব। কি অসহায় স্ববিরোধিতা। কি গ্লানি বহন করতে হয় কমরেডদের। শুধু হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ নয় বলে। তাই তাদের উদারতার ভান করতে হয়। সাম্প্রদায়িক মুসলীম দলগুলির সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের পবিত্র মনে করে. এক সময় মুসলিম লীগকে মাথায় মুলেছিল কেরালায়। এখন মাদ্রাজে. কি করুন জীবন। এই অসহায় স্ববিরোধী রাজনৈতিক প্রাণীগুলিই সারা দেশে একটা হিন্দু বিরোধী আবহাওয়া গড়ে তুলছে. রামজন্মভূমি নিয়ে অকারণ বিতর্ক তুলছে। হিন্দুরা তো মক্কার কাবা দখলের কথা বলেনি। যদিও মুসলমানেরাই বলে থাকেন মক্কার পবিত্র কাবা ছিল মক্কেশ্বরের মন্দির। ওখানে মুর্তি ছিল প্রচুর। ইসলাম উদ্ভবের আগে আরবের সবাই ছিল পৌত্তলিক। হিন্দুদের বক্তব্য বাবর নিজে বলেছে এবং এনসাইকোপিডিয়া বৃটানিকার দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা রয়েছে হ্যাঁ আমি কালান্দার শাহের নির্দেশে রামজন্মভূমিকে ধ্বংস করে মন্দিরের মশলা দিয়েই এই মসজিদ তৈরি করেছি। তাহলে যারা বিরোধিতা করছে তারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই করছে। যারা বিতর্ক তুলছে তারাও একটা চক্রান্তের জাল ছড়াবার জন্যই করছে। এরা আন্তর্জাতিক ইসলামী ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক। এরা বোঝাতে চায় কিছুতেই হিন্দু সংগঠন নয়। তাই আবহাওয়া এমন দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই যেন সব অশুচি। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বিচারে হিন্দুকে অপমানিত করছে, হিন্দুর ক্ষতি করছে আর হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু হিসাবে সংগঠিত না হয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কাছেই আশ্রয় নিচ্ছে। এই ছাগলাদ্য বুদ্ধি, নিজেই উৎসাহ নিয়ে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়া এগুলো দেখেই হিন্দুকে কেউ

মনুষ্যপদবাচ্য মনে করে না। যে সমাজকে শুধুমাত্র অনৈক্যের জন্য সংগঠিত সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতারা মানুষের সমাজ বলেই মনে করে না, তার আশা আকাঙ্ক্ষা মান মর্য্যাদার কথা তারা ভাবতে যাবে কেন? মুসলমানেরা অপমান করলেও তাদের সম্মানিত করতে হবে-এটাই এখন অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নীতি। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কাছে নতজানু হয়ে এরাই আবার ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা দিচ্ছে হিন্দু সমাজকে। এইসব আঘাতে জর্জরিত হিন্দু সমাজে ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে ভারতে হিন্দু জাগরণ যেটা ধোঁয়ার আকারে ছিল, রামের মন্দির ফেরৎ পাওয়ার সেটা যেন অগ্নিময় হয়ে উঠলো। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে অপরাধী মানসিকতায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো যেভাবে ভারতবর্ষ চলে আসছে আর কোনদিন সে ভাবে চলবে না। ভারতের অধিকাংশ মসজিদ স্মৃতিসৌধ হিন্দুর মন্দির আর প্রাসাদ ভেঙে তৈরি। একথা হিন্দুরা না জানলেও মুসলমানেরা জানে। তাই তাদের আতংকিত হবার কারণ আছে। সোমনাথের মন্দির যেদিন পুর্ণনিমাণ হয় সেদিনও তারা আতংকিত হোয়েছিল। জিন্না ঘোষণা করেছিলেন সেদিন, আজ যতো শিশু জন্মগ্রহণ করবে পাকিস্তানে, সকলের নাম রাখো সুলতান মামুদ। এই ঘোষণাকে অনেকে ভাবতে পারেন বিদ্বেষ আক্রোশ। একথা ঠিকই। কিন্তু যে ধর্ম বা দর্শন টিকে থাকে ঘৃণা বিদ্বেষ আর অত্যাচারের মধ্যে, তার একটা ভয় এবং আতংকও থাকে। যুক্তি নয়, মানবতা নয়, কোনো হৃদয়বত্তা নয়, আরো গায়ের জোর দেখিয়ে সব ঠিক রাখতে চায়।

একথা তো মৃত্যুর মতো সত্য ভারতের এবং সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা কেউই বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করে তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ দেখে গ্রহণ করেনি। গায়ের জোর, এবং প্রলোভন এই দুটি হাতিয়ারেই ইসলাম বিস্তৃত হয়েছে। যাঁরাই হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের তুলনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা সকলেই ইসলাম পরিত্যাগ করেছেন। এঁরা সাধারণ লেখাপড়া না জানা মুসলমান বা মোল্লা মৌলভী নয়। বিভিন্ন ইমাম

এম. এ. পি. এইচ. ডি. যাঁরা আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম পড়াতেন এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে এই মহান ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন ঃ মাদ্রাজের ইমাম শেখ আমীর মহম্মদ এখন অমরেশ আর্য্য। পশ্চিমবঙ্গের কোরান বিশারদ মীরাটের বড়ো মৌলভী সৈয়দ মেহবুব আলী এখন মহেন্দ্র পাল আর্য্য নামে হিন্দুধর্মের প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী আগাশাহী যার বাবা আবদুর রহমান উত্তরপ্রদেশের রামপুরের নবাব বংশের লোক। তিনি হিন্দুধর্মের মহত্বে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করেন, তাঁর নাম হয় পন্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দেব। মধ্যপ্রদেশের নবাব বংশের ডাক্তার এখন আনন্দ সুমন নামে হিন্দুধর্মের জন্য কাজ করছেন। এরকম হাজার হাজার ঘটনা ঘটে চলেছে। ওদের শ্রেষ্ঠ বক্তিরা চলে আসছে। সেটা ওরা পূরণ করতে চাইছে প্রলোভন এবং প্রেসার দিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়ে।

সংখ্যা দিয়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব হলে আজ পৃথিবীতে ইস্রায়েল বলে কোন রাষ্ট্র এবং ইহুদী বলে কোন জাতির অস্তিত্ব থাকতো না। গায়ের জোর পেট্রোডলার কিছুই চলে না সেখানে। ৪টি মুসলমান/ রাষ্ট্রকে তুর্কী নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে ৩০ লক্ষ ইহুদী। ইসলামের শক্তি নিরীহ বন্ধুভাবাপন্ন মানুষের প্রতি বড়ো তীব্র ভাবে প্রয়োগ হয়। হিন্দু নিরীহ অসংগঠিত দুর্বল তাই ভারতের মুসলমান মারমুখী আগ্রাসী অত্যাচারী। এটা তাদের দোষ না। জগতের নিয়ম হোচ্ছে দুর্বল আক্রমণকারীকে আমন্ত্রণ জানায়। দুর্বল থাকার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা। হিন্দু বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত উপেক্ষা কোরেছে। তাই তার জাতীয় জীবনে দুর্যোগ নেমে এসেছে। অপমান অসম্মান লাঞ্ছনা, পলায়ন, ভয় তার নিত্যসঙ্গী হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পরে হিন্দু আজ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁচার কথা ভাবতে শুরু করেছে। দেশের ভাবভঙ্গীও পাল্টাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে। পরিবর্তনের গতি বাড়াতে গেলে বিনা তর্কে হিন্দু সংগঠনগুলিকে সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। দেশ জাতি বাঁচলে পরে আবার

তর্ক করার সুযোগ পাওয়া যাবে, মার্ক্সবাদ বড়ো কি ধনতন্ত্রবাদ বড়ো। ধর্মনিরপেক্ষতা ভালো কি মন্দ, সবধর্ম সমান কিনা আলোচনারও প্রথম শর্ত দেশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে কিনা এবং তারা সশক্ত ও হিন্দুচেতনা সম্পন্ন কিনা। এই সত্যটা সর্বাগ্রে সমাজকে বুঝতেই হবে। রাজনৈতিক নেতা সৌখিন বুদ্ধিজীবির যদি শক্তিশালী দেশ দেখতে চান প্রথমে তাকে হিন্দু হিসাবে সংগঠিত হতে হবে। এই বস্তুটির অভাবের জন্য দেশে সমস্যার উদ্ভব। স্বাধীনতার প্রক্কালে ভারতের সকল মন্দির ভেঙ্গে করা মসজিদগুলি আবার মন্দিরে রূপান্তরিত করা উচিত ছিল। যেমন সোমনাথকে করা হলো। সব জাতি অপমানের চিহ্ন দাসত্বের চিহ্ন বিলুপ্ত করে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে অন্ততঃ সেদিন এইটুকু হিন্দুত্ববোধ জাতীয়তাবোধ ছিল। তাই সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, দীর্ঘদিনের জাতীয় কলংক অপনোদিত হলো। সর্দ্দার প্যাটেল আগেই লিখেছিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠা হিন্দু জনগণের সম্মান ও ভাবাবেগের বিষয়। মাত্র তেতাল্লিশ বছর পরে পরিস্থিতিটা কি? এখন হিন্দু জাতি তার কলঙ্ক চিহ্নগুলি অক্ষুণ্ণ রেখে গৌরব বোধ করে। তা নিয়ে বিতর্ক তোলে। ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলালা রায়চৌধুরী তাঁর ইতিহাসে দেখিয়েছেন ভারতের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদের ভিত্তি হিন্দুদের মন্দির। যাদের ইতিহাস পড়ার ধৈর্য্য নেই তারা অযোধ্যার রামমন্দির কাশী বিশ্বনাথের মন্দির মথুরার কৃষ্ণজন্মভূমি দেখলেই বুঝতে পারবেন একথার সবটুকুই সত্য।

তবু এই বিচিত্র দেশে প্রশ্ন ওঠে রামজন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? এলাহাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, রসুলপুর, ইসলামপুর, রসিদপুর, মুর্শিদাবাদ অজস্র স্থানের বিদেশী নাম কারা দিয়েছিল? ইসলামের বৈশিষ্ট্য বা বিকৃতিই হচ্ছে অন্য ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক শেষ চিহ্নটুকুও না রাখা। পারস্যে আর পারসিক সভ্যতার কোনো চিহ্ন নেই। ইরাণে বহু অনুসন্ধানেও আর তা চোখে পড়বে না। ভারতের প্রতিটি ধর্মস্থান, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের তারা

ধ্বংস সাধন করেছেন নাম পরিবর্তন করেছে। আগ্রহী মানুষ দেশ ভ্রমণের সময় একটু অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে মসজিদ কিম্বা মুসলীম স্থাপত্য বলে পরিচিত স্থানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সংশয়ের নিরসন হয়ে যাবে। আর যারা স্কলার গবেষক তাদের বাদশাহী অনুগ্রহপুষ্ট মোসাহেবদের দ্বারা কল্পিত নথিভিত্তিক ইতিহাস নয় তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের প্রতি আস্থাশীল হোতে হবে। অন্য সভ্যতাকে সমুলে বিনষ্ট করা যে ইসলামের অর্জিত অভ্যাস অতীতের প্রমাণ রয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে। বর্ত্তমানেও তা কষ্টকল্পিত নয়। করাচীর নাম হয়েছে ইসলামাবাদ। ময়মনসিংহের নাম হলো মোমেনশাহী। সম্প্রতি বাংলাদেশের ফরিদপুরকে করা হলো শরিয়ৎপুর। ভারতের মীনাক্ষীপুরমের নাম হলো রহমৎনগর। অন্যধর্মের মানুষ কিম্বা মন্দির নয় তাদের নাম এবং চিহ্নও মুসলমানদের কাছে অসহ্য। যারা রামজন্মভূমি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ঔদার্য্য দেখাচ্ছেন স্মৃতিসৌধ করে দিতে বলছেন। আবার তালা ঝুলিয়ে দেবার প্রস্তাব করছেন, তারা একটু চোখ বুজে ভাবুন এই খন্ডিত ভারতটুকুও মুসলীম কবলিত হয়ে গেছে। তারপরের দৃশ্যে কি দেখা যাবে? একটা মন্দির অক্ষত থাকছে! কোন মন্দির নিয়ে কেউ বিতর্ক তোলার সুযোগ পাবেন কেউ? পাকিস্তানে, বাংলাদেশে সে সুযোগ আছে? উদারতার সোল এজেন্ট এবং ডিস্ট্রিবিউটার্সরা বলেন, ওরা পারে। অন্য ধর্মকে ধ্বংস অন্যধর্মের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা কোরতে পারে। কিন্তু আমরা পারি না। মিথ্যে কথা, এরা নিজেদের মধ্যে লড়তে পারে। মিত্রদের বুকে ছুরি মারতে পারে। হিন্দু সমাজের ক্ষতি করতে পারে সমালোচনা করতে পারে। পারে না সত্যিকারের শত্রুদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথাটা বলতে। এরা উদার নয় নির্বোধও নয়। প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্রদ্রোহী। যুগে যুগে এরাই নিজ ধর্মের সর্বনাশ করে অন্য ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এদের সর্বনাশ করার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ শত্রুর চেয়েও বেশী। তাই নবজাগ্রত হিন্দু সমাজকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এদের প্রতি একটু কঠোর হতে হবে। কারণ পরিস্থিতি এমন

একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আজ আর দ্বিধা সংকোচ বা চক্ষুলজ্জার কোনো কারণ নেই, হিন্দু সমাজ যদি অন্যদের অর্থাৎ খৃষ্টান মুসলমানদের নিজের সমাজে আনতে দেরী করে ওরা হিন্দুদের নিজ ধর্মে গ্রাস করে নেবে। ভারতবর্ষ যদি পাকিস্তানকে ধ্বংস না করে, পাকিস্তান ভারতবর্ষকে ধ্বংস করে দেবে। দেবে নয় দিচ্ছে। খালিস্থান কাশ্মীর থেকে শুরু করে ভারতের প্রতিটি রাষ্ট্রবিরোধী কাজে পাকিস্তানের সাহায্য আছে তা আছে।

ইরাণ থেকে পাকিস্তান এই মুসলীম বলয়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু হিন্দুস্থান। এটা মুসলীম জাহানের কাছে একটা অসহ্য ব্যাপার। তাই তেলের দৌলতে বেসামাল আরবীর আমীরেরা কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে ভারতের সাম্প্রদায়িক মুসলিম সংগঠনগুলিকে। ভারতের হিন্দুসমাজ আজ অভিমন্যুর মতো সপ্তরথী পরিবেষ্টিত। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার। অভিমন্যুর সঙ্গে বর্তমান হিন্দু সমাজের পার্থক্য, অভিমন্যু চক্রব্যূহ থেকে নির্গমণের পথ জানতো না। যেটা আজকের হিন্দুসমাজ জানে। সকলেরই এটা জানা উচিত যে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র মধ্যযুগীয় অন্ধকারের আচ্ছন্ন। রোজই সামরিক অভ্যুত্থান। প্রতিটি রাষ্ট্র অস্থির সংঘর্ষশীল। শুধুমাত্র ইস্রায়েলের মোকাবেলা করার শক্তিও আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠির মধ্যে নেই। যেটা সবচেয়ে মারাত্মক কথা সেটা হচ্ছে আরবের তৈল সম্পদ প্রায় হয়ে এসেছে। আমীরি আর বেশিদিন নেই। তবুও তারা থামবে না। সম্পদ কমে এলে ভোগলালসা আরো বাড়ে। উত্তেজনা উন্মাদনা বাড়ে। এই উন্মাদনা প্রসুত যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের নাটক তারই এক একটি দৃশ্য এবং চরিত্র হচ্ছে শাহবানু মামলা, রামজন্মভূমি। রামজন্মভূমি যে হিন্দুদের ছিল তার আরও প্রমাণ আছে তুজুকই বাবরী গ্রন্থে। কারণ মন্দির ধ্বংস যতো সহজে হলো মসজিদ নির্মাণ অত সহজে হয়নি। সারাদিন ধরে মসজিদ তৈরি হয় আর রাত্রি বেলাতে ধবসে পড়ে যায়। এটা অলৌকিক ব্যাপার ধরে নিয়ে মোগলদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। অযোধ্যায় হিন্দুদের প্রবেশ

নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবুও মসজিদ আর তৈরি হয় না। আসলে ধর্মপ্রাণ বীর হিন্দুরা অন্ধকারে রাতে গিয়ে ভেঙে দিয়ে আসতো। খুবই বিপর্য্যস্ত হয়ে ফকির জালাল শা বাবরকে ডেকে পাঠালেন। বাবরকে অযোধ্যায় আসতে হলো। দুই ফকিরের কেরামতি তখন শেষ। বাবর শরণাপন্ন হলেন যোগী শ্যামানন্দের কাছে। যোগী শ্যামানন্দ শুনে বল্লেন আমার পাঁচটী সর্ত্ত মানলে মসজিদ তৈরি হতে পারে। বাবর সর্ত্ত মেনে নিলেন। এই সর্ত্তগুলোই লেখা আছে তুজুকই বাবরীতে। প্রথম এই মসজিদের নাম রাখতে হবে সীতাপাক, দ্বিতীয়, মসজিদে কোনো মিনার রাখা চলবে না, তৃতীয়, হিন্দু মন্দিরের মত পরিক্রমা করার ব্যবস্থা রাখতে হবে, চতুর্থ মসজিদের মূল দ্বারে চন্দন কাঠের ফলত রাখতে হবে। পঞ্চম প্রতিদিন হিন্দুরা রামজন্মস্থান পুজো করবে, মুসলমানেরা নামাজ পড়তে পারবে শুধু শুক্রবারে। সর্ত্ত সাপেক্ষে মসজিদ তৈরি হয়ে গেল মীর বাঁকীর তত্ত্বাবধানে। মসজিদের ওপর লেখা হলো সীতাপাক। মিনার তৈরি হলো না পরিক্রমণের পথ তৈরি হলো। চন্দন কাঠের ফলক প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো মর্য্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের মূর্তি। এই মসজিদে ব্যবহার কর হলো বিক্রমাদিত্যের ৮৪টি কষ্টিপাথরের স্তম্ভের মধ্যে থেকে ১২টি স্তম্ভ। এগুলো আজও অক্ষত আছে। কোনো মসজিদে চন্দন কাঠের ব্যবহার হয় না। এই মসজিদে চন্দন কাঠের ফলক কাঠের দরজা রয়েছে। মসজিদে মিনার থাকে এখানে তা নেই। প্রত্যেকটি স্তম্ভে রয়েছে রাম সীতা এবং হনুমানের মূর্তি। আশ্চর্য্যের কথা রামমন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করে অঙ্কিত আছে দশ অবতারের মূর্তি। তৃতীয় অবতার বরাহ পর্য্যন্ত স্বমহিমায় বিদ্যমান। কোনো মসজিদে বরাহ মূর্তি ভাবা যায়? হ্যাঁ ভাবা যায়। যদি কোনো দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক নেতারা বরাহ নন্দনদের মতো একগুঁয়ে এবং নির্বোধ হয়। সত্যি সত্যি হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের বিন্দুমাত্র ভালোবাসা থাকলে অন্য ধর্মের প্রতি তিলমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে তাদেরই উচিৎ ছিল রাম জন্মভূমিকে হিন্দুদের হাতে

তুলে দেওয়া। ঈশ্বরের বিচারে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু বিচারালয় অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। তাই একাধিক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান এগিয়ে এসেছেন। প্রবীন শিয়া নেতা নবাব হুজুর। মুসলিম যুব সম্মেলনের তরুণ নেতা মুখতার অব্বাস নকভি । ওই মসজিদের ট্রাষ্টি আব্বাস রিজভী ও জৌবাদ হোসেন। এঁরা বলেছেন শুধু রামজন্মভূমি নয় যেসব মন্দির বাদশারা দখল করে মসজিদ করেছিল তা সব হিন্দুদের ফেরৎ দেওয়া উচিৎ। মুখতার বলেছেন এতে হিন্দু মুসলিম ঐক্য জোরদার হবে। ঐতিহাসিক সত্য মেনে নিয়ে রামমন্দির হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। ঐতিহাসিক সত্য হলো যে বাবরী মসজিদ ছিল একটি মন্দির যা মোগলদের আগ্রাসী নীতির শিকার হয়। ভালো মুসলমানদের কথায় মৌলভী মোল্লা শাসিত মুসলমানেরা কোনোদিন কর্ণপাত করে না। হিন্দু সমাজের স্থবির রাজনৈতিক নেতারা এদের কথায় গুরুত্ব দেয় না। কারণ গণতন্ত্রে একটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অপেক্ষা দুজন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন সমাজ বিরোধীর মূল্য বেশি। কারণ দুটি তাদের ভোট। তাই ভারতের রাজনীতির মুখ প্রগতির দিকে নয় সাম্প্রদায়িকতার দিকে। এইজন্য বাবরী মসজিদ আমরা দখল করবোই এই বিবৃতির কোনো প্রতিবাদ হয় না। এখনই ভারত ভাঙার কথা ভাবছি না, শুনলে কোনো রাজনৈতিক নেতার রক্তে আগুন ধরে যায় না। আজমগড়ের ইমাম ওবাইদুল্লা খানের টেপ রেকর্ডের বক্তৃতায় ক্ষুব্ধ হয় না কোনো মার্ক্সবাদী কিম্বা গান্ধীবাদী। তিনি বলেছেন, সুপ্রীম কোর্টের নামেই হোক আর হাইকোর্টের নামেই হোক কোরাণ কিংবা শরীয়তে হাত দিলে ভারতে রক্তের নদী বইয়ে দেবো। হিন্দুদের জীভ কেটে নেবো। জীবন্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবো তাদের। এই টেপ প্রচারিত হচ্ছে সারা ভারতে। সুলেমান সাইত বলেছেন এই ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেই দিন বন্ধ হবে সেদিন সব হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এই সব কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ইন্দিরাজী একদিন বলেছিলেন মুসলিম লীগ এখন 'ডেড্ হর্স' মৃত ঘোড়া।

সুলেমান সাইত সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন না ম্যাডাম মুসলিম লীগ এখন ট্রেন্ড টাইগার। প্রশিক্ষিত বাঘ। সত্যিই তাই। ভারত ভাগের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ এখন মুসলীম লীগ। এইসব উক্তি হিন্দু সমাজকে কিরকম বিচলিত করে তুলছে রাজনীতির ব্যবসাদারেরা তার হিসেব রাখেন না। তাদের লক্ষ্য সামনের নির্বাচন। সামনের জেনারেশনের কি হবে তা ভাবার দায়িত্ব তাদের নয়। দেশ চলে যাক্ না। চলে যাক রামজন্মভূমি। আমার মন্ত্রীত্ব এম.এল.এ. কিংবা পঞ্চায়েতের সদস্যপদ যেন অটুট থাকে। এই যে সাময়িক ক্ষমতার গজদন্ত মিনার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সহজতম পথ হিন্দু সমাজ এখন এখানেও কুঠারাঘাতে উদ্যত। রামজন্মভূমিকে মুক্ত করার কথা অনেকদিন থেকেই ভাবছিল বিশ্বহিন্দু পরিষদ। ১৯৮৩ সালে তাঁরা এর জন্য একটা বিশেষ সংস্থা নির্মাণ করেন। "ধর্মস্থান মুক্তিযজ্ঞ সমিতি"। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এই সমিতি দাবী জানায়, কাশী বিশ্বনাথ, কৃষ্ণ জন্মস্থান এবং রামজন্মভূমি হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। এর উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানালেন যে দাবীপত্র উত্তর প্রদেশের সরকারের কাছে পাঠানো হোয়েছে। তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। সমিতি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে রইল।

কিন্তু কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা গেল না। ১৯৮৪ সালে গোরক্ষ পীঠের মোহন্ত অবৈদ্যনাথজীর সভাপতিত্বে গঠিত হলো "শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি যজ্ঞ সমিতি"। ৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর সরযু নদীয় তীরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু একত্রিত হোয়ে সংকল্প গ্রহণ করলো মন্দিরের দ্বার মুক্ত করার জন্য। ৮ই অক্টোবর অযোধ্যা থেকে পদযাত্রা শুরু হলো মন্দিরের মুক্তি দাবী নিয়ে। লক্ষ্ণৌ এ যাত্রা শেষ হলো ১৪ই অক্টোবর। বিকেলে অভূতপূর্ব জনসমাবেশে পুনরায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হলো। মন্দিরকে মুক্ত করতেই হবে। ১৫ই অক্টোবর জনমত গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীরাম জানকী রথের যাত্রা শুরু হলো। কোটি কোটি মানুষের আশীর্বাদ এবং সমর্থন নিয়ে বহু পথ পরিক্রমা করে ৩১শে অক্টোবর রথ পৌঁছালো দিল্লী। কিন্তু দুর্ভাগ্য

সেইদিনই ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলেন। এই জাতীয় বিপর্যয় দেখে সমিতির আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলো। মুহ্যমান অবস্থা কাটতেই এলো নির্বাচন। প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার মন্দির উদ্ধারের বিষয়টাকে গুরতব দিলেন না। ৮৫ সালের ৩রা নভেম্বর কর্ণাটকের উদীপিতে ভারতের হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সকল সাধু মহাত্মাদের নিয়ে গঠিত ধর্ম সংসদের অধিবেশন হলো। এই অধিবেশনেও সংসদ সিদ্ধান্ত নিলো ৮৬ সালের শিবরাত্রিতে রাম জন্মভূমি মুক্ত করা হবে। এই পটপ্রেক্ষায় শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি যজ্ঞ সমিতি উত্তর প্রদেশ সরকারকে একটি চরম পত্র দেয়, তাতে লেখা হয় ৮৬ সালের ৮ই মার্চ তারিখে যদি মন্দিরের তালা খুলে না দেওয়া হয় তাহলে সমিতি তালা ভাঙার আন্দোলন কোরতে বাধ্য হবে। ৫ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক রামজন্মভূমি অবরোধ করবে। সাজো সাজো রব পড়ে গেল উত্তর প্রদেশে। প্রস্তুতি চলতে লাগলো সারা ভারতে। এতোদিনে কেন্দ্র এবং রাজ্য বিচলিত বোধ করলো। হিন্দুদের গর্জনে একটু কর্ণপাত করলো।

বিচলিত হওয়ার কারণ ব্যাপক জনজাগরণ। হিন্দু জাগরণ। ভোটে আঘাত করাতে পারেন রামচন্দ্র, তাই রাজ্য সরকার নড়েচড়ে বসলেন। তার পরের ঘটনা সকলের জানা। উমেশ পাণ্ডের আবেদনে জেলা জজ শ্রীকৃষ্ণমোহন পাণ্ডে ১লা ফেব্রুয়ারী ডেকে পাঠান জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে। তিনি বলেন কোনো আদলতের রায়ে মন্দিরে তালা লাগানো হয়নি। তালা দিয়েছিল প্রশাসন। জেলা শাসক এবং এস. পি.-কে তিনি জিজ্ঞাসা করেন বিনা তালায় তাঁরা এই এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে পারবেন কিনা? জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার সম্মতি জানালে বিচারপতি আদেশ দিলেন তালা খুলে দেওয়ার জন্যে। সারা ভারতে হিন্দু সমাজের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল মুহূর্তে। আর অযোধ্যায়? এক সাংবাদিক আনন্দবাজারে লিখলেন, "যেন চোদ্দ বছর বনবাসের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায়"। যে রুদ্ধ আবেগ প্রায় পাঁচশো বছর ধরে কোটি কোটি হিন্দুর বুকে রুদ্ধ বেদনায় মূর্ছিত হোয়েছিল প্রাণের বন্যায় তাদের ভাসয়ে নিয়ে গেল মুক্তির আনন্দে।

সংবাদপত্র বলিষ্ঠভাবে সত্য নির্ধারণে এগিয়ে এলো না। সংবাদপত্র বিক্রয় বৃদ্ধির উপাদান হিসাবে বিষয়টি গ্রহণ করলো। চেষ্টাকৃত কৃত্রিম নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করলো বিদগ্ধ সাংবাদিকরা। আরবীর ডলারে পুষ্ট হলুদ সাংবাদিকতা এবং সুবজ রাজনীতির বিকৃত মানুষগুলো এর মধ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদের চক্রান্ত খুঁজে পেলেন। পরিষদের আগুন খেকো বক্তৃতায় যুদ্ধ জয়ের উল্লাস দেখতে পেলেন। ৭৬টি যুদ্ধে ৪৫০ বছর ধরে তিন লক্ষ মানুষ সেখানে শহীদ হলো। যে ঘটনা সারা পৃথিবীর সব আত্মদানের গৌরবকে ম্লান করে দিতে পারে। যে কীর্তি "গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে" গৃহীত হবার মতো, তার সব কিছুকে উপেক্ষা করে এদেশে প্রশ্ন তোলার মানুষ আছে ওটা রামমন্দির না বাবরা মসজিদ? এখন অবশ্য পাল্টা প্রশ্নও উঠছে যে এরা হিন্দু না বরাহশিশু? এরা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ একটা বাড়ী ভেঙে যখন তার পুর্ননির্মাণ শুরু হয় তখন বাড়ীর মালিক আরশোলা টিকিটিকি মাকড়সাদের কি হবে এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাড়ীর কনষ্ট্রাকশন সৌন্দর্য্য নিয়েই ভাবে। ক্রমবর্ধমান হিন্দু চেতনা এবং ক্রমঃশক্তিশালী হিন্দুসমাজ আজ সব ভাবনাই নতুন করে ভাবতে শুরু করছে। ভারতের পূর্বের ইতিহাসটাই বিকৃত এবং মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে নিত্যনতুন গবেষণায়। মুসলমানেরা ধ্বংস কোরতে এসেছিল নির্মাণ করতে অসেনি। সম্ভবত ছিল না। মরুসভ্যতা কোনো স্থাপত্য ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ তাদের মাপজোকের কোনো ধারণা ছিল না। যা কিছু তাদের সৃষ্টি বলে দেখানো হয়, আসলে তা সবই হিন্দুদের। মুসলিম শাসকেরা শুধুমাত্র বিকৃতি সাধন করে তাদের বলে চালাতে চেয়েছে। অসংখ্য জ্বলন্ত প্রমাণে এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত হোতে চলেছে। অনুগ্রহ ভোজী বাদশাহদের পোষা দাসদের বিবরণ নয়। এ্যাডভান্স হিষ্ট্রি রিসার্চ ওয়ার্ক আজ নতুন সত্য জনগণের সামনে এনে দিচ্ছে। হিন্দুর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত হচ্ছে জাতির সত্য ইতিহাস।

দু'একটা আরশোলা কিম্বা ইঁদুর জাতীয় পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী কিম্বা রাজনৈতিক নেতাদের গুরুত্ব দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। জাতীয় জাগরণের প্রবল স্রোতে এরা চিরকাল ভেসে যায় অথবা নতুন কোনো অন্ধকার কিম্বা গর্ত খোঁজে। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পথ অতিক্রম করে হিন্দু জাতি আজ মহাজাগরণের সম্মুখীন। ঠিক এই সময়ে রাম জন্মভূমি নিয়ে আলোচনা বাদানুবাদ হিন্দুর চোখ খুলতে সাহায্য করবে। অতীত গৌরব উপলব্ধি করতে আগ্রহ বৃদ্ধি করবে।

এর আগে কে জানতো একটি মন্দিরের জন্য হিন্দুরা এতো লড়াই লড়েছে, এতো প্রাণ দিয়েছে হাসিমুখে। যোগী শ্যামানন্দের শর্ত মেনে নিয়ে মসজিদ তৈরি হলেও হিন্দুরা তা মন থেকে মেনে নেয়নি। ক্যানিংহাম লিখেছেন, হিন্দুরা এই পরাজয় ভুলতে পারেনি। তারা রামজন্মভূমি উদ্ধারের কাজে সবরকম ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। বাবর হিন্দুদের এই মরীয়া অনমনীয় ভাব দেখে এক জরুরী আইন পাশ করলেন। এই আইন ঘোষণা করা হলোঃ হিন্দুস্থানের বাদশা বাবরের আদেশক্রমে এবং ফকির হজরত জালাল শাহের ইচ্ছানুসারে অযোধ্যার রামের জন্মস্থান রাজশক্তির অধিকারে নেওয়া হোয়েছে এবং তার কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছে। একটা অংশে হিন্দুদের পুজো করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে তারা মোটেই খুশী নয়। নানাভাবে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে। চিন্তিত বাদশা আবার আদেশ জারী করলেন।

অযোধ্যার শাসকদের প্রতি বাররের ফরমাণ, কোনো হিন্দু রথ যেন অযোধ্যায় প্রবেশ না করে। কোনো হিন্দু তীর্থযাত্রী অযোধ্যায় প্রবেশ করতে চাইলে তাকে তক্ষুণি যেন বন্দী করা হয়। বাদশাহের হুকুম যেন কঠোর ভাবে পালিত হয়। বাবরের নামে এই আদেশ জারী হওয়া মাত্রই হিন্দুদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রামজন্মভূমি উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলেন সকল স্তরের হিন্দু। এগিয়ে এলেন ধর্মাচার্য্য

সাধু সন্ন্যাসীর দল। ধর্মপ্রাণ হিন্দু রাজন্যমণ্ডলী। একের পর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধ চলেছে শত শত বছর ধরে। হিন্দু যুদ্ধ করতে জানে না, ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে না এই ঘটনায় কি তা প্রমাণিত হয়? ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী মহেশ্বরানন্দ বিরাট এক সন্ন্যাসী বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন হংসার রাজ্যের রাণী জয়কুমারী এবং তিন হাজার মহিলা। ভীষণ যুদ্ধ করে তারা মন্দির দখল করে নেয়। আজকাল যেসব সাধু সন্ন্যাসীরা ভোগের মধ্যে বাস করে ত্যাগের কথা বলেন। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার জন্য নিজেদের হিন্দু বলতে চান না এবং যেসব হিন্দু মেয়েরা শুধু নিজেদের সাজসজ্জা আর সৌন্দর্য্য চর্চা নিয়ে ব্যস্ত, তাদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। নিজেদের অভ্যাসের পরিবর্তন করা উচিত। বেদনার কথা মন্দির জয় করেও তাঁরা রক্ষা করতে পারেনি। কামানে সজ্জিত মোগল বাহিনীর আক্রমণে সকলেই বীরের মৃত্যুবরণ করে। এতো প্রাণ দানের পরেও হিন্দুরা প্রতিজ্ঞা করে যতোদিন শত্রুদের তাড়াতে না পারছি, জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে না পারছি ততোদিন আমরা ছাতা জুতো ব্যবহার করবো না। পাগড়ী বাঁধবো না। এই বীর ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা লড়াই চালিয়ে গেছে। বাবরের রাজত্বকালে চারবার হুমায়ুনের সময় দশবার। আকবরের আমলে কুড়িবার। এই কুড়িবার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ ভারতের স্বামী বলরামচারী। অংশগ্রহণ করে তাঁর হিন্দু যুব বাহিনী।

কুড়িবারের যুদ্ধে বহু হতাহত হয়। আকবরের হিন্দু সেনাপতিরাও এই যুদ্ধে সন্তুষ্ট ছিল না। পরিস্থিতি বুঝে আকবর আদেশ দিলেন একটি পৃথক স্থানে একটি ছোট রামমন্দির তৈরি করা হলো এবং তাদের পুজার্চ্চনার যেন কোন বাধা দেওয়া না হয়। যাঁরা রামজন্মভূমিকে কিংবদন্তী বলেন তাঁরা "আইন-ই-আকবরী"তে এই ঘটনার উল্লেখ দেখে নিতে পারেন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানের আমলে অবস্থা একটু শান্ত ছিল কারণ এদের বেশি আকর্ষণ ছিল নারী মাংসের প্রতি। আনারকলিকে নিয়ে পিতা-পুত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

পুত্রদের ভ্রাতৃঘাতী হত্যাকান্ড সামলাতেই এদের বেশি সময় কেটেছে। অযোধ্যার নবাবরাও জন্মভূমিতে কোনো হস্তক্ষেপ করেন নি। তাদের আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু খাঁটি মুসলমান! ঔরঙ্গজেব মসনদ দখল করেই শুরু করলেন নারকীয় তাণ্ডব। নিষ্ঠাবান মুসলমানের যা পরম কর্তব্য। ইতিহাস ঔরঙ্গজেবকে ধার্মিক পবিত্র মুসলমান হিসাবেই অঙ্কিত কোরেছে। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নৃশংসতা নির্মমতা ধ্বংস এবং ইসলাম সমার্থক। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব গোটা অযোধ্যাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এক বিশাল মোগল বাহিনী পাঠালেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলেন গুরু সমর্থস্বামী রামদাসের শিষ্য বৈকরদাস মহারাজ। তিনি মোগল সেনাপতি জাঁহাবাদ খাঁকে পর্যুদস্ত করে দেন। এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরদের সহযোগী ছিলেন দশহাজার চিমটেধারী সাধু। এই সাধুরা সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করে ৩০ বার। গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখ সেনাবাহিনী এগিয়ে আসে সাধুদের সাহায্যের জন্য। জন্মভূমি পুনরায় মুক্ত হয়।

এই গৌরবজনক ভূমিকার কথা শিখ সম্প্রদায় আজ বিস্মৃত হোয়েছে। ভ্রাতৃহত্যায় আজ তাদের উৎসাহ সীমাহীন। কিংবদন্তীর প্রবক্তারা দেখে নিতে পারেন আলমগীর নামার ৩২ পাতা। যেখানে ঔরঙ্গজেব লিখেছেন, কাফেররা ৩০ বার আক্রমণ করে। শাহী ফৌজ পরাজিত হয়। তীব্র আক্রমণ আসে গুরুগোবিন্দ সিং এবং বৈকরদাসের নেতৃত্বে। শাহজাদা এবং মনসবদার হাঁসান আলি খাঁ নিহত হয়। ফৈজাবাদ গেজেটিয়ারে ক্যানিংহাম লিখলেন, যুদ্ধ এমন ভয়ংকর হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। দিবারাত্র যুদ্ধ চলেছিল। মোগলবাহিনী পরাস্ত হলো। চত্বর পুর্ননির্মাণ হলো। মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রমাণিত হচ্ছে হিন্দুরা যখনই সামান্য সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ করেছে তখনই তাদের জয়লাভ করায়ত্ত হোয়েছে। এই পরাজয়ের অপমান কিন্তু ধার্মিক ঔরঙ্গজেব ভোলেনি। ৪ বছর পর এক অতর্কিত আক্রমণ করে শাহী ফৌজ দখল করে নেয় রামজন্মভূমি। আলমগীর নামায় নিজে

লিখে গেছেন ঔরঙ্গজেব, ৪ বছর বিরতির পর মোগল বাহিনী রমজান মাসের সপ্তম দিনে অযোধ্যা আক্রমণ করে। দশ হাজার হিন্দু নিহত হয়। চত্বর এবং দেবস্থান ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। যারা আক্রমণকারী তারা স্বীকার করছে ওটা রামজন্মভূমি আর কিছু ক্রীতদাস প্রশ্ন তুলছে ওটা মন্দির ছিল কিনা। বিচিত্র হিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজ। আরো বিচিত্র এদেশের রাজনৈতিক জীবকুল।

যদিও তারপর থেকে মন্দির মুসলমানদের কুক্ষিগত ছিল, কিন্তু প্রতি বছর রামনবমীর দিন ছোট বড়ো যুদ্ধ বেধে যেতো মন্দির উদ্ধারের জন্য। তারপর পট পরিবর্তন হলো। এলো ইংরেজ রাজত্ব। রামজন্মভূমির লড়াই কিন্তু অনির্বাণ। রামজন্মভূমি ইতিহাসই যেন প্রমাণ করছে ভারতের হিন্দু জীবন প্রবাহের অখণ্ড ধারাটিকে। প্রমাণ করছে হিন্দু সংগ্রামী জাতি যুদ্ধ-প্রবণ জাতি। হতাশ সেক্যুলার শূন্যবাদী সংগ্রাম বিমুখ হিন্দুদের কাছে রামজন্মভূমির ইতিহাস একটি উজ্জ্বল দর্পণ। হিন্দু জাগৃতির এই যুগসন্ধিক্ষণে দ্বিধাগ্রস্থ হিন্দু আত্মসমর্পণমুখী হিন্দু আপাতলাভে বিশ্বাসী হিন্দুদের উচিত এই দর্পণে নিজের মুখটি বারবার দেখা। নিজের গৌরবময় পরিচয়টিকে জানা। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হনুমানগড়ের মোহান্ত উদ্ধব দাস সশস্ত্র বিদ্রোহ করলেন জন্মভূমি উদ্ধারের জন্য। নবাব ওয়াজেদ আলির সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হলো। নবাব নিরুপায় হয়ে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলেন। অযোধ্যার রাজা মানসিংহের প্রচেষ্টায় নবাব ওয়াজেদ আলি আবার একটা ছোট মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহকালেও জন্মভূমি নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়েছে। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা আমীর আলি বলেন, শুরু থেকেই এটা হিন্দুদের মন্দির। এটা হিন্দুদের হাতে অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করা উচিত। এবার বিরোধিতা করে ইংরেজ। বরং ওয়াজেদ আলি যে অধিকার দিয়েছিলেন হিন্দুদের, তার ওপর বাধা নিষেধ আরোপ করতে থাকে। হিন্দুদের মনে অসন্তোষ বাড়তে থাকে।

অযোধ্যার নির্মোহী আখড়ার সন্ন্যাসীরা এক ভয়াবহ যুদ্ধ করে জন্মভূমির একাংশ দখল করে নেয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩৪-এ আবার চেষ্টা হয় সম্পূর্ণ জন্মভূমি অধিকারের। ইংরেজ এবং মুসলমান এক হয়ে গেল। ভয়ংকর দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হলো। সরযু নদী লাল হয়ে গেল হিন্দুদের রক্তে। বহু সাধু সন্তকে জেলে দেওয়া হলো।

ইংরেজ মন্দির উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে চিরতরে বন্ধ করার জন্য হিন্দুদের ওপর ধার্য্য করলো পিটুনীকর। মুসলমানদেরও বাবরী মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর কোনো মুসলমান ওখানে নামাজ পড়তে যায়নি। এই বিবরণ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে ওঠা হিন্দুদের রামজন্মভূমি মন্দির। মুসলমানেরা অন্যায়ভাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রাণ হরণ করে গায়ের জোরে প্রমাণ করতে চায় ওদের বাবরী মসজিদ। ভারতের অধিকাংশ স্থাপত্যকে যেমন ওরা দাবী করে থাকে তাদের বলে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত এই দাবি ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। ঠিক বাবরী মসজিদের মতোই তাজমহল শাজাহানের নির্মিত নয়। হিন্দুদের দখল করা প্রাসাদ যার পূর্বনাম ছিল তেজো মহালয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে হিন্দু মঙ্গল চিহ্ন। কবরখানায় যা কখনো থাকে না প্রাসাদেই যার সম্ভাব্যতা সেই সুড়ঙ্গ। যার হারেম হাজার হাজার নারী তার মমতাজের প্রতি বিশেষ প্রেম ভাবা যায় না। বিশেষ করে অসংখ্য সন্তান ধারণ করে যে মমতাজের শরীর সন্তান ধারণের পক্ষে অক্ষম হয়ে গিয়েছিল তার পরেও সন্তান ধারণ করতে বাধ্য হয়েই মমতাজ মারা যায়। শাজাহানের মমতাজ প্রেমের এই ইচ্ছে নমুনা। তাছাড়া নদীরধারে কবর হয় না। এগুলো না ভেবেই এদেশের কবি গীতিকারেরা শুধু কল্পনা এবং আবেগকে ভিত্তি করে কবিতা গান লেখেন। কুতুবমিনার হচ্ছে একটা প্রাচীন ভারতীয় মানমন্দির। কুতুবমিনারের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে হিন্দুর দেবমূর্তি। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ স্বীকার করেছেন কুতুবমিনার এবং তার সংগল্প স্থাপত্য হিন্দু

যুগের কীর্তি। দিল্লী আগ্রা আমেদাবাদ এলাহাবাদ বা ভারতের একটি শহরও মুসলমানদের তৈরি নয় তারা শুধু নাম পাল্টেছে মাত্র। ভেঙে চুরে ইসলামি জামা পরিয়েছে মাত্র।

অধিকাংশ কবর হিন্দু দর প্রাসাদ জবরদখল করে নির্মিত। যারা নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে খুনোখুনী চালিয়ে গেছে সারাজীবন, মারা যাবার পর তাদের জন্য অর্থব্যয় করে বিরাট স্মৃতিসৌধ বানিয়ে দেবে এটা ভাবা যায় কি? জামা মসজিদও ওদের নয়। তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করলে হিন্দুরা প্রতিরোধের জন্য জামা মসজিদে একত্রিত হয়েছিল। এতে কি প্রমাণ হয়? আহমেদাবাদের জামা মসজিদও তাই। ওটা ছিল ভদ্রাকালী মন্দির। বারান্দায় কুলুঙ্গীতে হিন্দু স্থাপত্য দেখা যায় এখনো। রানী শিপ্রি মসজিদ এবং রূপমতী মসজিদ নামেই বোঝা যায় এগুলো এদের প্রাসাদকেই মসজিদে রূপান্তরিত করা। নিজামুদ্দিনের কবর, হুমায়ুনের কবর ফিরোজ সাহ কোটলা, লোদী কবর, রোশেনারা কবর একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় এগুলি রাজপুত প্রাসাদ।

এদেশের মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে যারা এত বিশাল বিশাল কবরখানা এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করলো তারা জীবিতকালে নিজেদের বাসের জন্য কোনো প্রাসাদ তৈরি করেনি কেন? লালকেল্লাকে সবাই শাজাহানের নির্মিত বলে জানে। কিন্তু পৃথ্বিরাজ এই প্রাসাদে বাস করেছেন। নাম ছিল লালকোট। আকবর ছিলেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যক্তি চাটুকারেরা আকবরকে দেবতা বানিয়ে ছেড়েছেন। আকবর বহু হিন্দুনারীকে বিবাহ করেছিলেন। উদ্দেশ হিন্দু মুসলমান ঐক্য। আজকের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে এই প্রীতির উদ্দেশ্যে তিনি একজন হিন্দুর সঙ্গেও একটি মুসলমান রমনীর বিবাহ দেননি কেন? এই প্রশ্ন আজ অতীতকে ইতিহাসকে নতুন ভাবে শেখাচ্ছে। অত্যাচার নৃশংসতা ধ্বংসকে কৌশলে অনুগ্রহ পুষ্ঠরা রূপান্তরিত করেছে সৃষ্টি প্রেম ও ঔদার্য্যে। রামজন্মভূমি প্রকাশিত করেছে এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন

ভারতে প্রত্যেকটি মসিজদ আর স্মৃতি সৌধকে কেন্দ্র করে আছে ঘৃণ্য এবং রক্তাক্ত ইতিহাস, যা মিথ্যার পলেস্তারা দিয়ে আটকানো আছে মাত্র। এই পলেস্তারা খুলে গেলে প্রকটিত হবে একের পর এক সত্য ইতিহাস। যাদের মিত্র মনে কোরে হিন্দুরা বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছে প্রকাশিত হবে তাদের সত্যিকারের চরিত্র। এই আশংকাই উদ্বেগ করেছে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের। উত্তেজনায় তারা মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না। ভারতবর্ষ ভাঙার কথা বলছে, দাঙ্গার কথা বলছে।

১৯৮৬ সালে মন্দিরের তালা খুলে দেবার কিছুক্ষণ পরে দিল্লীর বোটক্লাবে মুসলমানদের একটি সভা হয়। আবদুল্লা বোখারী এই সভায় বলেন, এই দেখের আইন কানুন আমরা মানি না।

এদেশের স্বাধীনতা আমরা মানি না। এদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই। প্রমাণিত হলো আদালতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা।

শাহাবুদ্দিন ১৯৮৭ সালে ঘোষণা করলেন মুসলমানেরা এবার প্রজাতন্ত্র দিবস বয়কট করবে। ভারতের মানবিন্দুতে নাগরা ঠেকিয়ে এরা পরখ করতে চাইলো হিন্দুর মানসিকতা। হিন্দুর রাজনৈতিক পরম্পরার ভরসার। রাজনৈতিক দলগুলির ভাবনা চিন্তা যাই হোক্ জাতি হিসাবে হিন্দুরা দেশভাঙা দাঙ্গাবিলাস আর সহ্য করতে রাজী নয়। তাই জাগ্রত হিন্দু সমাজের নীরব রক্তচক্ষু এবং এই আগুন নিয়ে খেলায় আতংকিত মুসলমানেরা প্রতিবাদের ঝড় তুলল। তার প্রতিক্রিয়ারূপে বীর জেহাদীরা পশ্চাদপসরণ করলেন। অন্য বছরের তুলনায় ৮৭-র প্রজাতন্ত্র দিবস উৎসাহ এবং উচ্ছলতার সঙ্গে পালিত হলো। যেসব মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আগে প্রজাতন্ত্রের দিনে কোনো উৎসব পরিলক্ষিত হয়নি, ৮৭ সালে সেখানেও সাড়ম্বরে পালিত হলো।

অন্যদিকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ দেশব্যাপী জন জাগরণের নানা কার্য্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকলো অবিরাম। ৮৭ সালের সারা দেশ জুড়ে পরিক্রমা করলো রাম জানকী রথ। অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা গেল সর্বত্র। গুঞ্জন চলতে

লাগল এখানে রামচন্দ্রের মন্দির পুননির্মাণ হবে। শাহাবুদ্দিন বেড়িয়ে এলেন পুর্নবার। হুংকার দিলেন আমরা বাবরী মসজিদ এ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে লংমার্চ করে অযোধ্যার রামমন্দির দখল করে নেবো। তারিখও ঠিক হলো। ২৬শে জানুয়ারী। অযোধ্যার বিশ্বহিন্দু পরিষদ বিনীতভাবে বলল, অযোধ্যার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে যোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকবে। ভয় পেলেন শাহাবুদ্দিন। একবছর চুপ করে থেকে ৮৮ সালে আবার হুংকার ঃ ১৪ই অক্টোবর আমরা যাচ্ছি লংমার্চ্চ করে অযোধ্যায়। অযোধ্যার বিশ্বহিন্দু পরিষদ বলল, এসো যথাবিহিত সম্মান পুরসর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকবে।

দিল্লী বিশ্বহিন্দু পরিষদ একটি পোষ্টারে সারা নগর ছেয়ে ফেলল। ১৪ই অক্টোবর জামা মসজিদ চলো। গিয়ে কি হবে? আল্লাহ তালাকে তুলসীদাস রচিত হনুমান চাল্লিশা শোনাতে হবে। ইটকা বদলা পাথর। খুবই নীচু স্তরের জিনিষ। কিন্তু ঐতিহাসিক ফল প্রসব করলো। যে কথা কেউ কখনো বলেনি সৈয়দ শাহাবুদ্দিন তাই বললেন। কাগজে বিবৃতি দিলেন সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কারণে লংমার্চ প্রত্যাহার করে নিলাম। যিনি বর্তমান ভারতের জিন্না হতে চান। সময় এবং সুযোগ এলে ভারত ভাগুতে চান। যাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম মুসলিম ইন্ডিয়া, তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শুভবুদ্ধির প্রকাশ ঘটালেন। শুধুমাত্র হিন্দু শক্তির কিঞ্চিৎ প্রকাশে। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় শক্তিমানে শক্তিমানে। এতো তোষণ এতো কনসেশন দিয়েও তো কোনোদিন কোনো মুসলিম নেতার মুখ থেকে এতো আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ উক্তি শোনা যায়নি। প্রমাণিত হচ্ছে হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রথম শর্ত হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হওয়া। অনেকে আক্ষেপ করে থাকেন ভারতের মুসলমানেরা এদেশের ধারায় মিশতে চায় না। পৃথক থাকতে চায়। পৃথক আইন চায়।

এর জন্য তারা দায়ী নয়। দায়ী ভারতের মুল সমাজ। এবং হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা। পার্শীদের মতো সবাই ভদ্রভাবে স্বেচ্ছায় জাতীয় ধারায়

মিশে যায় না। মিসিয়ে নিতে হয়। এ বিষয়ে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা বড়োই দায়িত্বহীন। তারা রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন করে রাখতে চায়। প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে করিয়ে দেয় তোমরা ভারতীয় নও মুসলমান। সহজে নেতৃত্ব করার লোভে তাদের সেন্টিমেন্টকে মূলধন করে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগ্রহ করে শাহাবুদ্দিনেরা। আর ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের ফায়দা লুটে বিপুল বিত্তের অধিকারী হয় ইমাম আব্দুল্লা বোখারীরা। এরা গোটা মুসলিম সমাজকে বোকা বানাচ্ছে একথা বুঝতে পেরেও বহু মুসলমান বলতে পারে না। কারণ হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে। তারা মুসলমানদের জন্য আলাদা বিবাহ আইন করে দেয়; কাশ্মীরে মুসলমান বেশি বলে ৩৭০ ধারায় বিশেষ সুযোগ দেয়। শাহবানু মামলায় রায়ে দেখা গেছে সরকার যুক্তিবাদী মুসলমানদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। গায়ের জোরে একশো পঁচিশ ধারা পাল্টে ফেলা হলো। রাজনৈতিক দলগুলো একবার ভারতকে ভাগ করেছে ভৌগোলিক ভাবে। হিন্দু এবং মুসলমানের ভিত্তিতে। এই খণ্ডিত ভারতকে আবার ভাগ করেছে মানসিকভাবে। ভারতীয় আর সংখ্যালঘুতে। দেশের সব আইন কানুন ভারতীয়দের জন্য সংখ্যালঘুদের জন্য নয়। তাই বোখারী সাহেব বোট ক্লাবে বলতে পারলেন এদেশের আইন আমরা মানি না। কিন্তু মূল সমাজ ঘুমিয়ে নেই। তারা রামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ পর্বটিকে একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ দিল। দেশের সাধুসন্তরা কুম্ভ মেলায় সিদ্ধান্ত নিলেন ১৯৮৯ সালের ৯ই নভেম্বর নতুন রামজন্মভূমি মন্দিরের শিলাশ্যাস হবে অযোধ্যায়।

৩১শে সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি গ্রামে একটি করে শ্রীরাম নামাঙ্কিত ইট যার নাম শ্রীরামশিলা বিশিষ্ট পদ্ধতিতে পুজো হবে। এই পুজিত শিলাগুলি হবে মন্দিরের ভিত্তি। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে নেওয়া হবে একটি শিলার দাম। এক টাকা পঁচিশ

পয়সা। উদ্দেশ্য মন্দিরটা সবার পরশে পবিত্র করা একটি জাতীয় সৌধরূপে গড়ে উঠুক। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে হিন্দুত্বের শাশ্বত বাণী হিন্দু সংগঠনের আহ্বান পৌঁছে দেওয়া। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে শিলা পুজন শুরু হলো। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল কিছু সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক নেতা। তারা ভীষণভাবে বিরোধীতা করায় কার্যক্রমটি আরও বেশি প্রচার মহিমা পেয়ে জনচিত্তজয়ী হয়ে উঠলো। কার্টুন কবিতা সম্পাদকীয় বিশেষ প্রবন্ধে ছয়লাপ করে দিল রামশিলা নিয়ে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। জনজাগরণ দেখে অনেকে স্বীকার করলেন এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তারা অনুমান করতে পারেন নি। একজন বললেন স্বাধীনতা আন্দোলনের পর দেশব্যাপী এতো বড়ো আন্দোলন এদেশে হয়নি।

জনরোষ তাদের দিকে ধাবিত হবার আগেই তাঁরা সংযত হলেন। দেশের মানুষ হিন্দু সংগঠনের শক্তিকে নতুনভাবে মুল্যায়ন শুরু করলেন। ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে নির্দিষ্ট সময়ে এবং বিধিবদ্ধভাবে এই রকম একটি কার্য্যক্রমকে সফল করা আজকের দিনে আর কোনো সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। শক্তিই জগতের চালিকা শক্তি নিয়ামক শক্তি, এসত্য প্রমাণ করলো হিন্দু সমাজ। যারা কোনোদিন আদালতের রায় মানেনি। কোলকাতায় কোরাণ নিয়ে মামলা চাপ দিয়ে তুলে নিতে বাধ্য করেছে। শাহবানু রায় প্রত্যাহার করালো, বোটক্লাবে বল্ল এদেশের আইন আমরা মানি না। সেই আব্দুল্লা বোখারী সেই শাহাবুদ্দিন বললেন, আদালত যা রায় দেবে আমরা তা মাথা পেতে মেনে নেবো। আবার সেই চিরায়ত সত্য প্রমাণিত হলো। মূল সমাজ ঐক্যবদ্ধ হলো বাকীদের সম্প্রীতি ফেরাতে শুভবুদ্ধি জেগে উঠবে। মাথা পেতে আইন মানতে ইচ্ছা করবে। শক হুণেদের মতো মিশে যাবে জাতীয় ধারায়। লক্ষণীয় আব্দুল্লা বোখারী এবং তস্য পুত্র নির্মিত আদম সেনা তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে নিয়েছে। মাদানী কলিমুদ্দিনেরাও নির্বাক।

যুক্তি এবং ভালোবাসার পাত্র নিয়ে তো হিন্দু সমাজ অপেক্ষমান। ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে মন্দির বাবর ভেঙেছিল। কাবুলে বাবরের সমাধিতে ছাগল চরে বেড়ায়। ভাঙা অবহেলিত। বাবর আক্রমণকারী বলে আফগানরা সেটা সারায় না। ভারতের মুসলমানদের এতো বাবর প্রীতি কি স্বাভাবিক? বিশ্বহিন্দু পরিষদ বলছে ঃ আমরা মসজিদটি সরিয়ে দেবো অক্ষত অবস্থায়। সব ব্যয়ভার আমাদের। এ প্রস্তাব কি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাড়াবার জন্য? না সম্প্রীতির জন্য। মসজিদ সরাবার দৃষ্টান্ত মক্কা মদিনা মিশর কুয়েতে ইরাকে আছে। শিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা বলছেন অযোধ্যার মসজিদ নামাজ পড়বার জন্য বানানো হয়নি হয়েছিল হিন্দুদের বিব্রত করবার জন্য। মীর বাঁকির মাজার আছে সাহনবা গ্রামে। সেখানে প্রচুর জমি আছে। বাবরী মসজিদ সেখানে স্থানান্তরিত করা হোক। এরাও মুসলমান এদের দাবীকে রাজনৈতিক নেতারা , সংবাদপত্র মর্যাদা দিচ্ছে না। বাবরী মসজিদ শিয়াদের সম্পত্তি। তারা দিতে চাইছে। চীৎকার করছে সুসুরা। যাদের অধিকারই নেই। আর আস্ফলন করছে দুই কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং কিছু আহম্মুক। যারা কিছুই জানে না। ৪০৬ বছর ধরে ৭৬ বার যুদ্ধ হবার পরও তারা বলছে হঠাৎ এই মন্দির নিয়ে আন্দোলন কেন? দেশে কি আর সমস্যা নেই। এদের কে বোঝাবে যে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা ঐক্যের সেটা দিতে পারে এই ভাবে নির্মিত মন্দির। আর সমস্যা নৈতিকতার সেটা মার্ক্সকিম্বা ষ্ট্যালিন পূজোর আসেনি, আসবে রামের চরিত্র পূজা করলে। ষ্ট্রালিন পুজো মার্কস পুজো করলে কি হয় তার শেষতম প্রমাণ রাশিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ। নৃশংসতা পেশীবল এবং আকণ্ঠ দুনীতি যার শেষ কথা। রাম ধর্মীয় চরিত্র নয় আদর্শ চরিত্র। রামরাজ্য নামে আদর্শরাজ্য। বিষয়টিকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য আর নিজেদের পণ্ডিত প্রমাণের জন্য এরাই প্রশ্ন তুলছে এটাই রামচন্দ্রের জন্মভূমি তার প্রমাণ কি? তথ্য প্রমাণ সহযোগে বুদ্ধদেব যীশু মহম্মদ মহাবীর কারণ জন্মস্থান আবিষ্কার সম্ভব নয়। এরা

ইতিহাসে উঠে এসেছেন নিজের নিজের ধর্মগ্রন্থ থেকে। আর সেইসব গ্রন্থে আছে রামায়ণের চেয়েও আজগুবি সব ঘটনা। বাকীগুলো বিশ্বাসযোগ্য আর রামচন্দ্র কল্পনা এগুলো যুক্তির কথা নয়। কোরাণের আয়াত নাকি মহম্মদের কাছে নেমে এসেছে আল্লার কাছ থেকে জিব্রাইলের মাধ্যমে। এ নিয়ে কোনো মার্ক্সবাদী কিম্বা কোনো পণ্ডিতেই প্রশ্ন নেই সন্দেহ নেই। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের একটি মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের একগাছা চুল হারিয়ে যায়। একজন মুসলমানই তা চুরি করে এবং পরে তা পাওয়া যায়। এই কারণে পূর্ববঙ্গে অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করা হয় হাজার হাজার হিন্দু নিহত হয়। ওটাই যে মহম্মদের কেশ ছিল কিম্বা যেটি হারালো সেটাই ফিরে এলো কিনা এর কোনো প্রমাণ নেই। এবিষয়ে এদেশের বৃহন্নলারা নিস্তব্ধ। প্রশ্ন শুধু হিন্দুর ব্যাপারে। রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাজীবের পতনের পর এলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ। তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ করে চার মাসের সময় চেয়ে নিলেন। চারমাসে তিনি একবারও বৈঠকে বসলেন না। পরে ঘোষণা করলেন আদালতের রায় মেনে নিতে হবে। রাজার পারিষদেরা দেশ জুড়ে চীৎকার শুরু করে দিল বিশ্বহিন্দুপরিষদ আদালতের রায় মানতে চায় না। সরকার এবং আদালতই যে মন্দিরের তালা খুলে দিল এইসব আহাম্মুকেরা তা জানে না। আদালত নিয়মিত মাইনে দিয়ে রামচন্দ্রের পুজোর জন্য চারজন পুরোহিত নিয়োগ করলো তাও এরা জানে না। এরা সব জানে বলবে না। আদালতের প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধার কথা আগে কিছু বলা হয়েছে। আরো দু একটি বলা যেতে পারে। কেরালায় একটি সাম্প্রদায়িক বক্তৃতার জন্য দিল্লীর ইমাম আব্দুল্লা বোখারীর প্রতি কোর্ট বারবার সমন জারী করে। বোখারী থোরাই কেয়ার করেন। কোর্ট কিন্তু অপমানিতও মনে করে না। আইনানুগ ব্যবস্থাও নেয় না। দিল্লী কোর্টেও কোরাণ নিয়ে একটি মামলা হয়। বিচারপতি রায় দেন এই গ্রন্থে অনেক পরধর্ম বিদ্বেষী আয়াত আছে। কোনো ধর্মনিরপেক্ষ

দেশে এগুলো চলতে পারে না। সেই সব আয়াত অপসারিত করে আদালতকে সম্মান দেখানো হয়নি। এব্যাপারে মার্কসবাদী গান্ধীবাদী নেতা পন্ডিত বুদ্ধিজীবি সকলেই অন্ধ এব বধির কোলকাতার রাজাবাজারে হায়দ্রাবাদের চারমিনারের অনুকরণে একটি মসজিদ তৈরি হয়েছে। সরকার কর্পোরেশন কারো অনুমতি নেওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা করে আদালত এটি ভেঙে দেবার আদেশ দেয়। বাম দলগুলি কি করেছেন? যুগান্তরের অনিল ভট্টাচার্য্য ছাড়া কেউ কিছু লেখেননি। আদালতের রায় আজও কার্য্যকরী হয়নি। এরা যখন আদালতের কথা বলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে বলে তখন জনগণ ক্রুদ্ধ হয়। সিপি এমের লাল্লু আলমের হাতে থেঁতলে যাওয়া মাথায় ফেটি বেঁধে, কোলকাতার রাস্তার বেছে বেছে মুসলমানদের হাতে মমতা ব্যানার্জী রাখী বেঁধে দিচ্ছে এ দৃশ্য সংবাদপত্রে দেখে মানুষ ব্যঙ্গ করে। সবদল এক হয়ে সম্প্রীতির মিছিল করছে দেখলে জনতা বুঝতে পারে এটা হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত ষড়যন্ত্র। আর রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ঠেকাবার শেষ অপচেষ্টা। মরিয়া হয়ে ওঠার ফলে তারা আর নিজেদের কাজের ফলাফলের মুল্যায়ণ করতে পারছে না। মার্কসবাদীদের আদালত প্রীতি উদ্ধৃতি দু একটি দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমবাংলায়। হাই কোর্ট আদেশ দিলেও পার্টি জমির অধিকার দিচ্ছে না। শিক্ষককে স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছে না। রাজীবের আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখা গেছে শাহবানু কেসে, দেখা গেছে তিনবিঘা ব্যাপারে। মামলা বিচারাধীন তবু তিনি এরশাদকে বললেন, তিনবিঘা আপনাকে দিতে পারলে আনন্দিত হতাম। এ তো পরিষ্কার বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা। আর বিশ্বনাথ প্রতাপ। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে আলাদা করে বিচার করতে যাওয়াই এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। এরা সবাই এক পালকের পাখি। সুপ্রীম কোর্ট স্থগিতাদের দিল মন্ডল কমিশন সম্পর্কে। উনি তবু বলে চললেন, মন্ডল কমিশন আমি

কার্য কর করবোই। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিল আদবানীজির রাম রথ আটকানো যাবেনা। গ্রেপ্তার করা যাবে না। অযোধ্যার পঞ্চকোশি পরিক্রমা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তা বন্ধ করা যাবে না। তীর্থযাত্রীদের গ্রেপ্তার করা চলবে না। প্রত্যেকটি আদেশ অমান্য করা হলো। মধ্যরাত্রে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে অর্ডিন্যান্স জারী করা হলো। মুসলমানেরা গলা ধাক্কা দেবো বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার। আদলত থাক আগের প্রসঙ্গে আসা যাক। বিশ্বহিন্দুপরিষদ জুন মাসের শেষে ঘোষণা করলো, সরকারি হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর দেবোত্থান একাদশীর দিন অযোধ্যায় করসেবা অর্থাৎ স্বেচ্ছায় শ্রমদানের মধ্যে দিয়ে মন্দির নির্মাণ শুরু করবো। বিশ্বনাথ চার মাসের বেশি সময় পেলেন আরো। তিনি কিন্তু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেন না। আবদুল্লা বোখারিকে জামা মসজিদ সংস্কারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আর শুরু করলেন অপপ্রচার। মসজিদ আমরা কিছুতেই ভাঙতে দেবো না। বেতার দূরদর্শন বেশ কিছু সংবাদপত্র এবং বুদ্ধিজীবি তাঁর সহায়ক হলেন। সবাই জানেন এদেশে এখন বুদ্ধিজীবি আর দেহপোজীবিনীদের সঙ্গে কোন তফাত নেই। বিদ্যেবুদ্ধিশূন্য সুন্দরী অভিনেত্রী হলেও বুদ্ধিজীবিদের তালিকায় তার নাম থাকে। এরা বাংলাদেশে পাকিস্তানে হিন্দুত্যাগ মন্দির ধ্বংস হলে কিছু বলেন না। কাশ্মীরে হিন্দুহত্যা, দুলক্ষ হিন্দু বিতাড়নের পরও নির্বাক থাকেন। এদের সঙ্গে আরো পেলেন বামপন্থীদের পরও নির্বাক থাকেন। এদের সঙ্গে আরো পেলেন বামপন্থীদের। প্রধান পরামর্শদাতারূপে পেলেন জ্যোতিবসুকে। এরা সবাই মিলে অপপ্রচার শুরু করে দিলেন, হিন্দুরা মসজিদ ভাঙতে চায়। অপপ্রচারের বেলুনটি নতুন করে ফাটিয়ে দিলেন অরুণ শৌরী। তিনি একাধিক কাগজে লিখলেন ভি. পি. নিজে আর এস এস নেতাদের বলেছিলেন, ওখানে মসজিদ কোথায়? যা আছে ওঠা ভাঙবার প্রয়োজন কি? একটা ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। আপনারা যদি সবাই

একখানা করে ইট বাড়ি নিয়ে যান ওখানে কিছুই থাকবে না। আদবানিজীকে বলেছিলেন ভি. পি আমি আপনার সঙ্গে অযোধ্যায় করসেবা করতে যাবো। এসব কথা হয়েছিল নির্বাচনের আগে। বিশ্বাস করে এজন্যই চারমাস সময় দিয়েছিল পরিষদ। প্রতিশ্রুতি পালন না করায় বলেছিল বিশ্বাস ঘাতক। বিশ্বনাথ এটা কেন করলেন? একদল সাংবাদিকের মতে তিনি চাতুরীসম্রাট মিথ্যাই ওঁর জীবন চলার পাথেয়। কিছু পত্রিকার মতে আরবের টাকাই ভিপিকে হিন্দুর শত্রুতে পরিণত করেছে। একথার সত্যতা আছে। উত্তর প্রদেশের বলিষ্ঠ পত্রিকা 'চেতনা' লিখছে শুধুমাত্র মুলায়েম সিং যাদব আরব থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা পেয়েছে। ভিপির প্রাপ্তির পরিমাণটা অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু অনেকেই অনুমান করতে পারলেন না হিন্দুদের হৃদয়ের উত্তাপটা। হিন্দু জাগরণের ডিগ্রীটা। সারা ভারতে রামজ্যোতি রথের পরিক্রমা শুরু হলো। উত্তাল হয়ে গেল সাদা দেশ। তাতে নতুন মাত্রা যোগ করলো আদবানিজীর রামরথ পরিক্রমা। আসেতু হিমাচল উদ্বেল হয়ে উঠলো। ভি. পি. আর মুলায়েম পাগল হয়ে গেল। পরিখা খনন, বিদ্যুৎ বাহিত তারের বেড়া, লোহার ফেনসি, পুলিস বি এস এফ, তামিলনাড়ু ফোর্স, ইন্ডো টিবেটিয়ান ফোর্স, সি আর পি এবং মিলিটারীকে প্রস্তুত রাখা হলো। সারা উত্তরপ্রদেশ হয়ে উঠলো একটি কনসেন্টেশন ক্যাম্প। মুলায়েম সিং যাদব নবভারত টাইমসকে বললেন, মন্দির কা ফয়সালা স্রিফ ডান্ডে মে হায়। সাংবাদিকরা লিখলেন বোফর্স কামান ছাড়া সবরকম অস্ত্রের সমাবেশ হয়েছে। পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর এইরকম ব্যবস্থা নিলে কবে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। ভিপির প্রত্যেকটি নোংরা কাজে সমর্থন এবং পরামর্শ জুগিয়েছে সি পি এম। মুলায়েমের সকল অন্যায় কাজে প্রেরণা দিয়েছেন জ্যোতিবাবু। বারবার ছুটে গেছেন ইউ পি। হিন্দু যৌবন জলতরঙ্গ রুখতেই হবে। অবজ্ঞা-উপেক্ষা অপপ্রচার দিয়ে। লাঠি, গুলি, বর্বরতা অত্যাচার দিয়ে। কিন্তু বালি দিয়ে যেমন দড়ি তৈরী করা যায় না তেমনি জাতীয় উত্থানকে প্রতিরোধ করা

যায়না। স্বাধীনতা আন্দোলনের অপেক্ষা সহস্রগুণ আত্মবলিদানের অকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠলো সারা দেশবাসীর মুখে। লক্ষ লক্ষ মা বাবা তাদের ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন অযোধ্যায়। এ এক অভূতপূর্ব জ.নজাগৃতি। যা ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। এ খেতে দাও পড়তে দাও নইলে গদী ছেড়ে দাও এর কলকাতা বেড়াবার প্রলোভনী আন্দোলন নয়। হারাবার জন্য আছে শৃঙ্খল পাবার জন্য আছে রাজ্যের প্রেরণাও নেই এখানে। শুধু রামমন্দির উদ্ধারের জন্য ৭৭ তম সংগ্রামের সূচনামাত্রা। বাবর মীরবাঁকির মতো ভিপি মূলায়েম অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করতে লাগল রামভক্ত হিন্দুদের হত্যা করার জন্য। আর রামভক্তরা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম সব উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল অযোধ্যায় দিকে। তাদের শ্লোগান চাই চাই মন্দির চাই অযোধ্যাতেই মন্দির চাই। আর গান সরফরোশী কি তামান্না আব হামারা দিল মে হায় দেখনা হায় জোর কিতনা বাজু এ কাতিলমে হায়। মানে, আত্মদানের ইচ্ছা হৃদয়ে জেগেছে। দেখতে চাই খুনির বাহুতে কতটা শক্তি আছে। একমাস আগে থেকে উত্তরপ্রদেশের জেল ভর্তি হয়ে গেল। স্কুল কলেজ ধর্মশালা মাঠকে জেলখানা বানানো হলো। ২৩শে অক্টোবর আদবানিজী গ্রেপ্তার হতেই সারা ভারত কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বি. জে. পি প্রত্যাহার করে নিলো সমর্থন। ভি পি সরকারের যারা ছিল পাল্কীবাহক তারা শববাহকে পরিণত হলো। ৭ই নভেম্বর সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেবার মিথ্যা অজুহাতে আরো কদিন রয়ে গেলেন ভি পি । সারা দেশ থমথম করতে লাগলো। ৮০ কোটি মানুষের দৃষ্টি মন সব তখন অযোধ্যায়। দূরদর্শন বেতার বর্জন করেছে মানুষ। সব বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে তারা। আনন্দবাজার প্রায় পরিত্যক্ত। বর্তমান বিক্রী হচ্ছিল পাঁচটাকায়। তারপর এলো চরম মুহূর্ত। ৩০ অক্টোবর। জনগণ প্রশাসন সাংবাদিক সকলের সহযোগিতা আর হিন্দুদের অদম্য মনোবলে মুলায়েমের সব প্রতিরোধ চুর্ণ হয়ে গেল। করসেবকরা প্রবেশ করলো মন্দিরে। গম্বুজে তুলে দিল গৈরিক পতাকা। গ্রেপ্তার লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাস গুলি খেযে পড়ে যাচ্ছে পাশের লোক তবু তাদের গতিরোধ করা গেল

না। বিশ্বহিন্দু পরিষদের সম্পাদক অশোক সিংঘল প্রায় জেমস্ বণ্ডের মতো কায়দায় পৌঁছে গেলেন অযোধ্যা। নেতৃত্ব দিলেন আহত হলেন হাসপাতাল থেকে উধাও হলেন। সারা ভারতের হিন্দু সমাজে তখন তড়িৎ প্রবাহের মত বিস্ময়াবিষ্ট আনন্দ উত্তেজনা। ২ রা নভেম্বর আবার করসেবা। লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রেপ্তার তবু হাজারে হাজারে মানুষ এগিয়ে আসছে। তিনদিন আগে যেখানে বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেখানেই আবার যাচ্ছে আগে কেবা প্রাণ করিবেক দানের মনোভাব আর ব্যস্ততা নিয়ে। প্রত্যেকদিন তিনি চারবার করে ষ্টাফ পাল্টাচ্ছে-মূলায়েম। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। শেষ পর্য্যন্ত শিখ মুসলমান সি আর পি দিয়েছে মুলায়েম। আদেশ দিয়েছে নির্বচারে গুলি চালাবার। নিজে হেলিকপ্টারে ঘুরে বেড়িয়েছে অযোধ্যার উপরে। মেশিনগানধারী জওয়ান সহ। হিন্দুর বিরুদ্ধে এরকম যুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক নেতা করেনি। ২রা নভেম্বর আর একটি জালিয়ান ওয়ালাবাগ রচিত হলো অযোধ্যায়। নিরস্ত্র হিন্দুর প্রাণ এবং রক্তে। কয়েক হাজার আহত হলো মারাত্মক। নিহত হলো শত শত। মাথা লক্ষ্য করে গুলি চলল। বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে এসে গুলি করে মারা হলো। দেশের সব রাজনৈতিক দল মুলায়েমকে অভিনন্দন জানালো। বুদ্ধিজীবিরা নীরব সমর্থন জানালো। শত শত মরেছে, হাজার হাজার হিন্দু মরলেও এদের এই ভূমিকাই থাকবে। হিন্দু সমাজ যদি এখনও তার শত্রুমিত্র চিনতে ভুল করে রাজনৈতিক নেতা নির্বাচনে ভুল করে তাহলে হিন্দুকে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারও বাঁচাতে পারবেন না। কিন্তু হিন্দু মরবে না। মরে বাঁচা হিন্দু শিখে নিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত নৃশংসতার মধ্যে শত শত হিন্দু প্রাণ দিয়ে কুড়ি লক্ষ হিন্দু গ্রেপ্তার হয়ে প্রমাণ দিল, হিন্দুত্বের নামে হিন্দু আজ মরতে শিখেছে। প্রাণের ঝুঁকি নিতে শিখেছে। তাদের আরো একটি কাজ করতে হবে। হিন্দু কি হিন্দুত্ব কি হিন্দু সংগঠনগুলি সত্যি কি চায় জনগণকে ব্যাপকভাবে বোঝাতে হবে। সব মুসলমান হিন্দুর শত্রু নয়। মুখতার আব্বাস নকভি ৩০০০ করসেবক নিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। হিন্দুর

প্রকৃত শত্রু ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতারা। কর্মী সমর্থক নয়। তারা এগিয়ে আসছে হিন্দু সংগঠনের দিকে। তারা বুঝতে পারছে তাদের কি করা উচিত।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতা কর্মীরা প্রতিটি সভায় বলছে, হিন্দু বলতে আমরা বুঝি ভারতে উদ্ভুত যে কোনো ধর্মের অনুরাগী যিনি ভারতবর্ষকে না বলে মনে করেন। হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়ত্ব এক। বরং হিন্দু শব্দটি একটু ব্যাপক। ভারতীয় শব্দের মধ্যে আইনগত সাগরিকত্বের প্রশ্ন আসে। কিন্তু যে কোনো মানুষ ইচ্ছা করলেই হিন্দু হতে পারেন। হিন্দু রাষ্ট্র হলেও যারা হিন্দু নয় তাদের কোনো বিপদ নেই। যে কোনো হিন্দু পাড়ায় মসজিদ কিম্বা মুসলিম মুসলমান পাড়ার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল অহিন্দুরা সেখানে কোনোদিন বিপন্ন হয়নি। এদেশে কি গান্ধীবাদী কি মার্ক্সবাদী সবাই চেষ্টা করে হিন্দুরাষ্ট্র সম্পর্কে একটা আতংকের সৃষ্টি করতে। বলে সংখ্যালঘুর সম্প্রদায়িকতার চেয়ে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা বেশি বিপজ্জনক। যদিও হিন্দুকে কেউ কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে দেখেনি। এই বঙ্গের লেখকেরা মুসলিম রাষ্ট্র হলে কি হবে জেনেও হিন্দুরাষ্ট্র রামরাজ্য নিয়ে আদিরসাত্মক রচনা লেখেন। ইতিহাস জেনেও সি পি আই নেতা রাজ্যেশ্বর রাও অযোধ্যায় গিয়ে প্রশ্ন তোলেন এটাই যে রামচন্দ্রের জন্মভূমি তার কোনো প্রমাণ আছে কি? একটি কিশোর এগিয়ে এসে বল্ল স্যার আপনি যাকে সারাজীবন বাবা বলে জেনে এসেছেন, তিনি ই যে আপনার অরিজিন্যাল বাবা তার কোনো প্রমাণ আছে? কোনো কোর্টের রায় কিম্বা রক্তের নাম্বার? না আপনার মা যাকে চিনিয়ে দিয়েছে তাকেই পরম বিশ্বাসে বাবা বলে ডেকে এসেছেন? রাজ্যেশ্বর একটু হতচকিত হয়ে গেলেন। বললেন তার সঙ্গে রামজন্মভূমির কি সম্পর্ক?

শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।

মূল্য : ৮.০০ টাকা।